রামাযানের সাধনা
হাফেয মাওঃ হুসাইন বিন সোহরাব
(অনার্স হাদীস)
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, মদীনা, সউদী আরব
ও
মাওলানা মুন্তাসির আহমাদ রাহমানী

রামাযানের সাধনা

হাফেয মাওঃ হুসাইন বিন সোহ্‌রাব
(অনার্স-হাদীস)
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, মদীনা
সঊদী আরব।
ও
মাওঃ মুন্‌তাসির আহ্‌মাদ রাহমানী

সূচীপত্র

মাওলানা মুন্তাসির আহমাদ রাহমানী প্রণীত অংশ–

সূচীপত্র

হাফেয মাওলানা হুসাইন বিন সোহ্‌রাব প্রণীত অংশ

মাওলানা মুন্তাসির আহমাদ রাহমানী প্রণীত অংশ–

রামাযান নামের কারণ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدلله الذى لم يزل ولايزال حيا قيوما قديرا نحمده حمدامتتاليا ونشكره شكرا متتابعا ونكبره تكبيرا والصلواة والسلام على من ارسله الى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا وعلى اله واصحابه وازواجه واهل بيته واتباعه الصالحين وائمة الدين تسليما كثيرا –

امابعد

চন্দ্রের গমনাগমন দ্বারা যে বৎসর পরিমিত হয়, তার নাম চান্দ্র বৎসর। তা মুহাররাম মাস হতে আরম্ভ হয়ে যিলহাজ্জ মাসে শেষ হয় এবং তা দ্বারাই ইসলামী সন হিজরী গণনা করা হয়। উক্ত বৎসরের নবম মাস "রামাযান" নামে অভিহিত। পবিত্র কুরআনে মাস সমূহের সংখ্যা বার বলে স্বীকৃত হয়েছে। কিন্তু রামাযান ব্যতীত অন্য কোন মাসের নাম উল্লেখ হয়নি।

সূরা আল-বাকারায় রামাযানের উল্লেখ করে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ

شهر رمضان الذى انزل فيه القران هدى للنل س وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه *

রামাযান মাস যাতে ও যার সম্বন্ধে পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। যে কুরআন মানুষ জাতির পথ প্রদর্শক এবং যাতে সঠিক পথের নিদর্শনসমূহ বিদ্যমান এবং যা সত্য ও অসত্যের মধ্যে পার্থক্যকারী; অতএব, যারা এই মাসকে প্রত্যক্ষ করবে তাদের রোযা পালন করতেই হবে। (সূরা ঃ আল-বাক্বারা ১৮৫ আয়াত)

আল্লামা মাজ্‌দুদ্দিন ফিরুযাবাদী উক্ত মাসের রামাযান নামে অভিহিত হওয়ার কারণ উল্লেখ করেছেন।

প্রথমত ঃ উক্ত মাসে উপবাসকারীগণের পেটের জ্বালা অত্যধিক হয় বলে তার নাম রাখা হয়েছে রামাযান।

দ্বিতীয়ত ঃ এই মাসে (রোযা দ্বারা) পাপরাশি ক্ষমা হয়ে যায় বলে তাকে রামাযান নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

তৃতীয়ত ঃ রামাযান আল্লাহর অন্যতম নাম এবং উহা ও গাফির غافر শব্দদ্বয়ের অর্থ অভিন্ন। অর্থাৎ পাপ বিমোচক ও ক্ষমার আধার।

(কামুস ২য় খণ্ড ৩৩২-৩৩৩ পৃষ্ঠা)

পূর্বের আলোচনা দ্বারা স্বভাবতঃ মনে জাগে কুরআন মাজিদে বার মাসের মধ্যে শুধু রামাযানের নাম উল্লেখ করা হয়েছে কেন? তার বিশেষত্বই বা কি? একটু চিন্তা ও মনোযোগ দিলেই পূর্বের লিখা আয়াত দ্বারা এর মর্মার্থ জানা যাবে যে, দিশাহারা মানব জাতির পথ প্রদর্শকরূপে যে মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের আবির্ভাব এই ক্ষণস্থায়ী জগতে হয়েছিল– তা সর্বপ্রথম রামাযান মাসেই অবতীর্ণ হয়েছিল।

সূরা আল-ক্বাদারে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

নিশ্চয়ই আমি কুরআনকে (রামাযানের) মহীয়সী রজনীতে অবতীর্ণ করেছি। এবং (হে রাসূল!) মহীয়সী রজনী কিরূপ তা কি আপনি অবগত আছেন? মহীয়সী রজনী হাজার রজনী অপেক্ষা উত্তম। ওতে ফেরেস্তাগণ তাঁদের প্রভুর অনুমতি ক্রমে প্রভাতকাল পর্যন্ত সকল বিষয়ের জন্য শান্তি নিয়ে আগমন করেন।

উল্লিখিত আয়াতসমূহের দ্বারা নিঃসন্দেহে প্রতীয়মান হয় যে, আল-কুরআন রামাযান মাসেই এক মহীয়সী রাত্রে বা "লাইলাতুল ক্বাদারে" অবতীর্ণ হতে আরম্ভ হয়েছে এবং ধারাবাহিক ভাবে অবতীর্ণ হয়ে সুদীর্ঘ ২৩ বৎসরে সম্পূর্ণতা লাভ করেছে। অর্থাৎ পথভ্রষ্ট মানব জাতির ব্যক্তিগত, সামাজিক, রাষ্ট্রিক, অর্থনৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনকে সুপথে পরিচালিত করবার নিমিত্ত; কল্পনা বিলাসিতা, গতানুগতিকতা ও স্বার্থপরতার অমঙ্গলজনক পরিণতি হতে ত্রাণকর্তারূপে এবং সত্য ও মিথ্যা,

দোষ ও গুণ, ন্যায় ও অন্যায়ের খিঁচুড়ী সংমিশ্রণের গোঁজামিল দ্বারা কিংকর্তব্যবিমূঢ় জগৎবাসীকে পরিত্রাণ প্রদানের জন্য যে 'ফোরকান' পথহারা বিশ্বমানবের ভাগ্যাকাশে শুভ প্রভাতের সূর্যরূপে উদিত হয়েছিল তা রামাযানেরই এক তামস রজনীতে সংঘটিত হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দীর্ঘ দিনের প্রানান্তকর সাধনা এই মুবারক মাসেই সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল এবং রিসালাত ও নবুওয়াতের অমূল্য নিয়ামাত আল্লাহর মহা দান ও আল-কুরআনের ধারক-বাহক ও প্রচারক হওয়ার গৌরব তিনি উক্তমাসে লাভ করেছিলেন, তাই রামাযানের এত গৌরব এবং এই কারণেই আল-কুরআনে তার নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

ফাযায়েলে রামাযান

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্যান্য মাস অপেক্ষা রামাযান মাসে কুরআনের বিশেষ আলোচনায় এবং বারবার অধ্যয়নে লিপ্ত থাকতেন, দান দক্ষিণায় তাঁর অবস্থা এই মাসে ব্যাপক আকার ধারণ করত।

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেছেন ঃ সকল মানুষ অপেক্ষা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বভাবতঃ অধিকতর দানশীল ছিলেন এবং যখন জিব্রাঈল (আঃ) তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতেন রামাযান মাসে, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দানশীলতা ব্যাপক আকার ধারণ করত। জিব্রাঈল (আঃ) রামাযানের শেষ রাত্রি পর্যন্ত প্রত্যেক রাত্রেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাথে মিলিত হতেন এবং তিনি তাঁকে কুরআন শুনাতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে যখন জিব্রাঈল (আঃ) সাক্ষাৎ করতেন তখন তাঁর দানশীলতা ঝড় বা তুফানের আকার ধারণ করত। (বুখারী, নাসায়ী)

আবু হুরাইরা (রাঃ) প্রমুখ বর্ণনা করেছেন ঃ রামাযান আগমন করলে আকাশের বা বেহেস্তের দরজা সমূহ খুলে যায়। দোযখের দরজাসমূহ বন্ধ এবং শয়তানকে শৃঙ্খলিত করা হয়। অন্য বর্ণনা মতে রাহমাতের দরজাগুলো খুলে দেওয়া হয়। (বুখারী)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন রামাযানের প্রথম রাত আরম্ভ হয় তখনই শয়তান ও দুষ্ট জ্বিনদেরকে আবদ্ধ এবং নরকের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেওয়া হয়। একটি দরজাও খোলা থাকে না। বেহেস্তের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হয়, একটিও বন্ধ রাখা হয় না এবং প্রতিদিন বলতে থাকে, হে কল্যাণকামীগণ অগ্রসর হও! অসৎ ও অনাচারীর দল বিরত হও। পাপকাজ থেকে বিরত থাক।

আল্লাহ রামাযানের প্রত্যেক রাত্রেই কতকগুলো জাহান্নামী-কে মুক্তি প্রদান করেন। **(তিরমিযী, ইবনু মাজাহ)**

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

তোমাদের কাছে রামাযান সমাগত; তা অতি সমৃদ্ধশালী মাস। মহিমান্বিত আল্লাহ ওর সিয়ামকে (রোযা) তোমাদের প্রতি ফরয করেছেন, ওতে আকাশমণ্ডলীর দরজা খুলে দেওয়া হয়েছে, দোযখের দরজাগুলি বন্ধ এবং শয়তানগণকে শৃঙ্খলিত করা হয়। উক্ত মাসের এক রাত্রি আল্লাহর কাছে এক হাজার মাস অপেক্ষাও উত্তম; যে ব্যক্তি উক্ত রাত্রির সাওয়াব হতে বঞ্চিত হল সে বহু কল্যাণ হতে বঞ্চিত হল। (নাসায়ী)

রোযার ফযীলত

ইমাম বুখারী (রঃ) আবূ হুরাইরা (রাঃ) কর্তৃক রিওয়ায়াত করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সিয়াম ঢাল স্বরূপ। এতে অশ্লীলতা এবং মূর্খতা পরিহার করবে, কোন ব্যক্তি মারামারি করতে প্রবৃত্ত হলে বা গালাগালি করলে দুইবার বলবে আমি রোযা পালন করছি। যার হাতে আমার প্রাণ, সেই আল্লাহর শপথ, সিয়াম পালন কারীর মুখের ঘ্রাণ আল্লাহর নিকট মিশ্‌কের (মৃগনাভির) ঘ্রাণ অপেক্ষা অধিকতর উত্তম। (আল্লাহ বলেন) সে আমার জন্যই পানাহার ও স্ত্রী সঙ্গমের ইচ্ছা ত্যাগ করে। সিয়ামের ইবাদত আমার জন্য এবং আমি স্বয়ং এর প্রতিদান প্রদান করব। প্রত্যেক সৎ কাজের দশগুণ পুরস্কার প্রদত্ত হবে। (বুখারী)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "নিশ্চয় বেহেশতের একটি দ্বার রাইয়ান নামে অভিহিত। প্রলয় দিবসে শুধু সিয়াম

পালনকারীগণ উক্ত দ্বারে প্রবেশ করবেন, অন্য কেউ প্রবেশ করবে না। তাদের প্রবেশান্তে দ্বার রুদ্ধ হবে, অপর কেউ উক্ত দ্বারে প্রবেশ করবে না।"
(বুখারী)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি বিশ্বাস ও সাওয়াব লাভের আশায় রামাযানের রোযা পালন করবে তার পূর্ববর্তী (সাধারণ) পাপ সমূহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে। (বুখারী, মুসলিম, ইবনু মাজাহ)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সিয়াম ও আল-কুরআন, রোযাদারের জন্য কিয়ামত দিবসে সুপারিশ করবে। সিয়াম বলবে– হে প্রভু! আমি দিবসে তার পানাহার ও প্রবৃত্তিপরায়নতা হতে তাকে বিরত রেখেছি। তার সম্পর্কে আজ আমার সুপারিশ গ্রহণ করুন এবং কুরআন বলবে– আমি রজনীতে তাকে নিদ্রা ত্যাগে বাধ্য করেছিলাম। অতএব, তার সম্বন্ধে আমার সুপারিশ রক্ষা করুন। আল্লাহ উভয়ের সুপারিশ গ্রহণ করবেন। (বাইহাকী)

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ কিন্তু সাওম (রোযা), এটা আমার জন্য এবং আমি স্বয়ং এর পুরস্কার প্রদান করব। সে আমার জন্য স্ত্রী সম্ভোগের বাসনা ও আহারাদি পরিহার করে। সিয়াম পালনকারী দুইটি সন্তুষ্টি লাভ করবে, সন্ধ্যাকালে ইফতারের সময় এবং পরকালে আল্লাহর সাথে সাক্ষাত লাভের সময়। (বুখারী, মুসলিম)

সন্দেহ দিবসের রোযা

সিয়ামের ইবাদত আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট হওয়ার তাৎপর্য এই যে, অন্যান্য ইবাদতের বিপরীত এর অনুষ্ঠান ও আচরণ লোক চক্ষুর অন্তরালেই হয়ে থাকে। লোক সমক্ষে আমরা রোযাদার হওয়ার বড়াই করতে পারি, কিন্তু যথাযথভাবে ও নিষ্ঠা সহকারে আমরা সিয়ামের সাধনা উদযাপিত করছি কি না, যিনি সকলের চক্ষু নিরীক্ষণ করে থাকেন এবং যার নিকট যা সংগোপিত তা সুপ্রকাশিত, একমাত্র তার চক্ষুই তা দর্শন করবে। সুতরাং সিয়ামের পুরস্কার তার নিকট হতেই প্রত্যাশা করা যেতে পারে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কখনও তোমাদের কোন ব্যক্তির পক্ষে রামাযানের পূর্বে এক বা দুই দিন সিয়াম পালন করা উচিত নয়। হ্যাঁ, যদি কোন ব্যক্তি নির্দিষ্ট দিনে সিয়াম পালনে অভ্যস্ত হয় তবে সেই দিন সে রোযা রাখতে পারবে।

(বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী)

ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল (রঃ) তাঁর মুসনাদে ইবনু আব্বাস (রাঃ) কর্তৃক রিওয়ায়াত করেছেন যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

রামাযানের চাঁদ দেখে রোযা রাখ এবং ঐ চাঁদ দেখে ঈদ উৎসব পালন কর। যদি চন্দ্র এবং তোমাদের মধ্যে বাদল থাকে অর্থাৎ আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকায় চন্দ্র দেখা না যায়, তবে শাবানের সংখ্যা ত্রিশ পূর্ণ কর এবং শাবানে অভ্যর্থনা স্বরূপ রোযা পালন কর না।

(নাইলুল আওতার ৪র্থ খণ্ড ১৯১ পৃষ্ঠা)

শাবান মাসের অর্ধেকের পর রোযা নিষিদ্ধ হওয়ার তাৎপর্য এই যে, উক্ত সময়ে সিয়াম পালনে ব্যস্ত হলে রামাযান আসার পূর্বেই দুর্বলতা ও শক্তিহীনতা দেখা দিবে এবং ফরয রোযা পালনে বিঘ্ন সৃষ্টি হবে। পক্ষান্তরে, উক্ত দিবসসমূহে আহারাদি দ্বারা শক্তি সামর্থ অর্জন করে রামাযানের সাধনায় প্রবৃত্ত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। সাধারণ সাওয়াবের জন্য মহাপ্রতিদানকে হারানো উচিত নয়।

আমাদের ভ্রাতা-ভগ্নিগণের অনেকেই শাবান মাসের শেষ দিবস রামাযানের চন্দ্র দেখতে বিঘ্ন ঘটলে ও রামাযানের ১ম দিন সন্দেহে উক্ত দিবস সিয়াম পালন করে থাকেন। তাদের ধারণা যে, উক্ত দিবস রামাযানের প্রথম দিবস হলে যাতে এর মহা পুণ্য হতে বঞ্চিত না হন এইজন্য সিয়াম পালন করা উচিত। আর যদি এটা প্রকৃতপক্ষে রামাযান না হয় বরং শাবানের ত্রিশ তারিখ হয়, তবে উক্ত রোযা নফল রোযা রূপে গণ্য হবে। কিন্তু সকলের অবগত হওয়া উচিত যে, ঐরূপ দিবস শারীয়াতের পরিভাষায় ইয়াওমুশ্শাক (يوم الشك) সন্দেহ দিবস নামে অভিহিত এবং উক্ত দিবসে সিয়াম পালন করা নিষিদ্ধ। উপরোল্লিখিত হাদীস সমূহের দ্বারা তা স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে।

তিরমিযী, আবূ দাউদ ও দারাকুতনী হতে আরও বর্ণিত আছে রাবী বলেন, একদিন আমরা (শাবানের ত্রিশ তারিখ) আম্মার ইবনু ইয়াসির সাহাবী (রাঃ)-এর নিকট ছিলাম। আমাদের সামনে একটি কাবাবকৃত মেষ (গোশ্‌ত) উপনীত হল। আম্মার সকলকে খাওয়ার নির্দেশ দিলেন। কেউ কেউ রোযাদার বলে ভক্ষণ হতে বিরত থাকতে চেষ্টা করলেন, তখন আম্মার (রাঃ) বললেন ঃ

যে ব্যক্তি সন্দেহ দিবসে রোযা পালন করবে সে আবুল কাসিম মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিরুদ্ধাচরণ করবে।

(দারকুৎনী, আবূ দাউদ, তিরমিযী)

চন্দ্রোদয়ের সাক্ষ্য ও দর্শনে পড়বার দু'আ

রামাযানের চন্দ্রোদয় সম্বন্ধে একজন বিশ্বাসী মুসলমানের সাক্ষ্য গৃহীত হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন পল্লীবাসী (اعرابی) মুসলমানের সাক্ষ্য গ্রহণ করে সিয়াম পালন করতে মদিনাবাসী মুসলমানগণকে নির্দেশ দিয়ে ছিলেন। **(আবূ দাউদ)**

আবদুল্লাহ ইবনু উমারের (রাঃ) সাক্ষ্যও এই সম্বন্ধে গ্রহণ করা হয়েছিল। পক্ষান্তরে ঈদুল ফিতরের চন্দ্র দর্শনের জন্য কম পক্ষে দুই জন সাক্ষী ছাড়া গ্রহণ যোগ্য হবে না। **(আবূ দাউদ)**

রামাযানের চন্দ্র দর্শন করে নিম্নলিখিত দু'আ পাঠ করা বাঞ্ছনীয় ঃ

اللهم اهله علينا بالامن والايمان والسلامة والاسلام ربى وربك الله *

উচ্চারণ ঃ আল্লামুম্মা আহিল্লাহু 'আলাইনা বিল আমনি ওয়াল ঈমানি ওয়াস সালামাতি ওয়াল ইসলামি রাব্বী ওয়ারাব্বুকাল্লাহ।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! তুমি (চাঁদকে) উদয় কর আমাদের প্রতি নিরাপত্তা, ঈমান, শান্তি ও ইসলামের সাথে। হে চাঁদ! আমার প্রভু ও তোমার প্রভু এক আল্লাহ। **(তিরমিযী)**

সাহারী ও নিয়্যাত

রোযা রাখার নির্দেশ প্রদান করে ইসলাম মানুষের ইচ্ছা এবং কর্মশক্তিকে একেবারে গলা টিপে মারতে চায়নি। বরং এটাকে সুনিয়ন্ত্রিত ও সুসংযত করতে চেয়েছে এবং যাতে মানুষ শুদ্ধাচারী ও পরহেযগার হতে পারে, ইসলামী কৃচ্ছসাধন রোযায়– সেই ব্যবস্থা রয়েছে। কর্মশক্তি যাতে বিনষ্ট না হয় ও পেটের দাবীও পূর্ণ হয়, এজন্য সুবহে সাদিক হওয়ার আগেই পানাহারের ব্যবস্থা দেওয়া হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر *

খাও এবং পান কর শ্বেত বা সাদা সূতা কালো সূতা হতে প্রকাশ হওয়ার পূর্বে।

অর্থাৎ "ফযরের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত পানাহার করতে থাক।

(সূরা ঃ আল বাক্বারা ১৮৭ আয়াত)

ইসলামী পরিভাষায় উক্ত পানাহার সাহারী বা প্রভাতী নামে অভিহিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার উম্মতগণকে এতে উদ্বুদ্ধ করে বলেছেন ঃ

تسحروا فان فى السحور بركة *

জন মণ্ডলী! সাহারী ভক্ষণ কর; কেননা এতে অতি বরকত (সমৃদ্ধি) নিহিত রয়েছে। **(বুখারী, মুসলিম)**

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমাদের রোযা ও আহলে কিতাবগণের উপবাসের মধ্যে পার্থক্য সাহারী খাওয়া। **(মুসলিম)**

নিদ্রা যাওয়ার পর তাদের জন্য পানাহার অবৈধ ছিল এবং আমাদের জন্য সুবহে সাদিক পর্যন্ত এটা বৈধ করা হয়েছে। যথাসম্ভব সাহারী বিলম্বে সুবহে সাদিকের একটু পূর্বে খাওয়া উত্তম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহারী এবং ফজরের নামাযের মধ্যে ৫০ আয়াত পাঠন যোগ্য সময় ব্যবধান থাকত। হাদীসে এর প্রশংসা করা হয়েছে।

(বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী)

সুবহে সাদিকের পূর্বে ফরয রোযার নিয়্যাত (সঙ্কল্প) করা উচিত। তিরমিযী, আবূ দাউদ ও নাসাঈ প্রভৃতি হাদীস গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

যে ব্যক্তি ফজরের পূর্বে রোযার নিয়্যাত করল না, তার রোযা হবে না। (তিরমিযী, আবূ দাউদ, নাসায়ী)

নিয়্যাতের জন্য কোন উর্দু কিংবা আরবীতে গদ পড়া নিষ্প্রয়োজন; বরং এটা নতুন মত, ইসলামের নতুন আবিষ্কার। নিয়্যাত অর্থ দৃঢ় সঙ্কল্প করা এবং অন্তরের সাথে এর সম্বন্ধ।

ইফতারে বিলম্ব করা অনুচিত

রোযার ইফতারে বিলম্ব করা উচিত নয় বরং সূর্য অস্তমিত হওয়ার সাথে সাথেই অবিলম্বে ইফতার করা কর্তব্য। সূর্য অস্তমিত হওয়ার সাথে তাড়াতাড়ি ইফতার করাই আল্লাহর নিকট অতি প্রিয়। (তিরমিযী)

ইফতার করাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলিম জাতির বৈশিষ্ট্য বলেছেন। খেজুর দ্বারা ইফতার করা ভাল, না পাওয়া গেলে পানিই যথেষ্ট। (আবূ দাউদ, দারেমী, তিরমিযী)

রোযার সময়ের কর্তব্য

সিয়ামের এই সময়টিকে যাতে সৎকার্যে ব্যবহার করা যায়, সেইদিকে রোযাদার ব্যক্তির সচেতন থাকা উচিত। শারীরিক অঙ্গ সমূহকে পরিচালনা করা অপরিহার্য কর্তব্য। সাংসারিক কর্মে লিপ্ত থাকলেও সিয়ামের কথা বিস্মৃত হওয়া মোটেই উচিত নয়। রামাযানের দিবানিশি কুরআন তিলাওয়াত, তাসবীহ ও তাহলীল বা অন্যান্য ইবাদতের মধ্যে এই মহাব্রতটি পালন করা একান্ত কর্তব্য। কারণ রোযা শুধু উপোস থাকার নাম নয়, বরং নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট শর্তানুসারে পানাহার, সঙ্গম, মৈথুন ইত্যাদি হতে বিরতির নামই সিয়াম।

এতে হিংসা, বিদ্বেষ, ক্রোধ, শঠতা, কপটতা, ধোঁকাবাজী, অত্যাচার, অনাচার, পরনিন্দা, চুগলী ও পরস্পর ঝগড়া কলহ ইত্যাদি অবশ্যই বর্জনীয়। সিয়াম দিবসে সুবহে সাদিক হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার, স্ত্রীসঙ্গম ও তৎসম্পর্কীয় অশ্লীল আলোচনা ও উপরোল্লিখিত ব্যাধি সমূহ হতে রোযাদারকে অবশ্যই বাঁচতে হবে। কেননা এতে রোযা ভঙ্গ হয়ে যায়। হাদীসে এর বিশদ আলোচনা রয়েছে। নিম্নে অতি সংক্ষিপ্তভাবে উদাহরণ দেওয়া হল ঃ

রোযা রেখে চিৎকার করা, সঙ্গম বিষয়ের অশ্লীল আলোচনা করা ও গালি গালাজ ইত্যাদি সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। **(বুখারী, মুসলিম)**

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন তোমাদের রোযা দিবস হয়, তখন অশ্লীল বাক্যালাপ ও অযথা চিৎকার করবে না। অন্য বর্ণনাতে রয়েছে মূর্খতা প্রকাশ করবে না। যদি কেউ গালাগালী করে কিংবা লড়াই করতে উদ্যত হয় তবে দুইবার বলবে আমি রোযাদার।
(বুখারী, মুসলিম, নাইলুল আওতার ৪র্থ খণ্ড ২০৭ পৃষ্ঠা)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি রোযা রেখে মিথ্যা কথা বলা এবং তৎপ্রতি আমল করা পরিত্যাগ করল না, তার পানাহার পরিত্যাগ করার কোন আবশ্যকতা নেই। আল্লাহর এতে কোন প্রয়োজনীয়তা নেই। **(বুখারী, আবূ দাঊদ)**

অর্থাৎ তার রোযা পরিগৃহীত হবে না।

তাবারানী আনাসের (রাঃ) সূত্রে বর্ণনা করেছেন ঃ

من لم يدع الخنى والكذب *

যে ব্যক্তি অশ্লীল কথাবার্তা এবং মিথ্যা বাক্য পরিহার করল না, তার আহার পানীয় পরিত্যাগ করার কোন আবশ্যকতা নেই।
(নাইলুল আওতার ৪র্থ খণ্ড ২০৯ পৃষ্ঠা)

রোযা রেখে স্ত্রীসঙ্গম নিষিদ্ধ

রামাযান মাসের দিবসে স্ত্রীসঙ্গমে লিপ্ত হলে রোযা ভঙ্গ হবে এবং দণ্ড দিতে হবে। একটি রোযার পরিবর্তে একটা দাস মুক্ত করবে, অপারগ হলে পরপর দুইমাস রোযা রাখবে, অন্যথায় ষাটজন দরিদ্রকে আহার প্রদান করবে। **(বুখারী, তিরমিযী)**

এটাই একটি রোযার কাফ্ফারা বা জরিমানা।

ভুল বশত পানাহারে রোযা ভঙ্গ হয় না

যদি কোন রোযাদার ব্যক্তি ভুল করে পানাহার করে, তবে তার রোযা ভঙ্গ হবে না, বরং তাকে ঐ রোযাই পূর্ণ করতে হবে। **(বুখারী, তিরমিযী)**

সঙ্গমে লিপ্ত হওয়ার ভয় না থাকলে চুম্বন বা মর্দন দ্বারা রোযা ভঙ্গ হবে না। **(বুখারী, তিরমিযী)**

কিন্তু আমাদের মতে যুবকগণকে এটা হতে বিরত থাকাই উচিত।

রোযা রেখে মিসওয়াক করা, গোসল করা ও সুরমা লাগানো বৈধ

সিয়াম পালনাবস্থায় মিসওয়াক করা নিষিদ্ধ নয় এতে রোযায় কোন প্রকার ত্রুটি আসবে না। **(বুখারী, তিরমিযী)**

রামাযান মাসে দ্বিপ্রহরের পূর্বে গোসল করলে রোযার কোন প্রকার ত্রুটি আসবে না। কোন দিন নাপাকী অবস্থায় রাত্রি প্রভাত হয়ে গেলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রভাতের পর গোসল করেছেন। **(বুখারী, তিরমিযী)**

রামাযানে সিঙ্গা লাগালে রোযা ভঙ্গ হবে না কিন্তু দুর্বল ব্যক্তির বিরত থাকাই বাঞ্ছনীয়। সুরমা চক্ষে দিলেও রোযা ভঙ্গ হয় না। **(বুখারী, তিরমিযী)**

রামাযানের রাত্রে স্ত্রীসঙ্গম নিষিদ্ধ নয়

রামাযানের রাত্রিতে স্ত্রীসঙ্গম করতে পারবে। আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

احل لكم لية الصيام الرفث الى نسائكم هن لباس لكم و انتم لباس لهن ـ علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم فتاب عليكم وعفاعنكم فالان باشروهن وابتغوا ماكتب الله لكم *

অর্থাৎ– রামাযান মাসের রাত্রিকালে তোমাদের জন্য স্ত্রীগণের সাথে সহবাস হালাল করা হয়েছে। তারা তোমাদের বস্ত্র (স্বরূপ) এবং তোমরাও তাদের বস্ত্র বা লেবাস। তোমরা নিজের আত্মার প্রতি যে অন্যায় করছিলে আল্লাহ্ তা অবগত আছেন। সুতরাং তিনি তোমাদের তাওবা ক্ববূল করেছেন এবং তোমাদের ক্রটি ক্ষমা করেছেন। অতএব, এখন (রাত্রিকালে) তাদের সাথে সহবাস কর এবং আল্লাহ্ তোমাদের জন্য যা (যে সন্তানাদি) লিপিবদ্ধ করেছেন তা তালাশ কর।

(সূরা ঃ আল-বাক্বারা ১৮৭ আয়াত)

রোযা ভাঙ্গনের ক্ষতি

যারা ইচ্ছাপূর্বক বিনা কারণে রোযা ভঙ্গ করে, তাদের সম্বন্ধে কঠোর মন্তব্য করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

যে ব্যক্তি রামাযানে শারীয়াতের নির্দেশিত রুখসাত কিংবা রোগ ব্যতীত একটি রোযা ত্যাগ করবে, পূর্ণ বৎসর সিয়াম পালন করলেও তার ক্ষতি পূরণ হবে না। **(বুখারী, তিরমিযী)**

অতএব, মুসলমানের মধ্যে যারা যুক্তিসঙ্গত শারয়ী কারণ ব্যতীত শুধু অলসতা বা আত্মপূজারী সেজে রোযা রাখে না অথবা রোযা রাখার নিয়ম কানুনও ভঙ্গ করে, তারা মহা পাপী। আল্লাহর নাফারমানির (অবাধ্যতার) জন্য তাদেরকে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে। ইহকালেও তারা লোক চক্ষে ঘৃণিত এবং সমাজে লাঞ্ছিত, নিন্দিত ও অপমানিত।

রোগী ও মুসাফিরের রোযা

যে মুসলমান গৃহবাসী নন, অর্থাৎ প্রবাস গমন করেছেন এবং যারা অসুস্থ– রোযা পালনে অসমর্থ, তাদের সম্বন্ধে আল্লাহ তা'আলা সূরা আল বাক্বারার ১৮৪-১৮৫ আয়াতে স্পষ্ট বলেছেন ঃ

এবং তোমাদের যারা ব্যাধিগ্রস্ত কিংবা প্রবাসী, তাদেরকে (রামাযানের পরিবর্তে) অন্য সময় সিয়াম পালন করতে হবে। আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজই করতে ইচ্ছা করেন এবং কঠিন করতে ইচ্ছা করেন না।

উপরোল্লিখিত আয়াত দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে যে, রোগী এবং প্রবাসী মুসলমানের জন্য রামাযানের রোযা যথা সময়েই পালন করা অবশ্যম্ভাবী নয়। বরং যখন সুবিধা হয় তখনই এটা পালন করতে পারবে।

বুখারী, মুসলিম প্রভৃতি মা আয়িশা (রাঃ) প্রমুখ রিওয়ায়াত করেছেন যে, হামযা ইবনু আমর আসলামী (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ আমি প্রবাসে রোযা রাখব কি? (ইনি অধিক সময় রোযা রাখতেন) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তরে বললেন ঃ

ইচ্ছা করলে রোযা রাখতে পার এবং ইচ্ছা করলে নাও রাখতে পার।
(বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী)

প্রবাসে রোযা রাখা কিংবা না রাখা উভয়ই জায়িয আছে। এতে অধিকাংশ জ্ঞানী ও সুধীজনের দ্বিমত নেই। কিন্তু কোনটি শ্রেয়, রোযা না ইফতার, এর মধ্যে মতবিরোধ আছে। এ সম্বন্ধে সুধীজনের মতামত চার ভাগে বিভক্ত করা যায় যথা–

(১) কতিপয় আলিম বলেছেন ঃ উভয়ই সমান এবং প্রবাসীর ইচ্ছাধীন।

(২) কোন কোন জ্ঞানী বলেছেন ঃ প্রবাসীর পক্ষে যা সহজ হয় তাই উত্তম।

(৩) ইমাম আহমাদ, ইসহাক ইবনু রাহওই, সাঈদ ইবনু মুসাইইব ও আওযায়ী প্রবাসে ইফতার করাকেই সবচেয়ে উত্তম বলেছেন।

(৪) ইমাম শাফিয়ী, ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম মালিক ও সওরী

প্রভৃতি অধিকাংশ ইমামগণের মতে যদি প্রবাসী রোযা পালনে সমর্থ হয় তবে তার জন্য রোযা পালন করাই উত্তম বা শ্রেয়। (তিরমিযী)

প্রত্যেক মতাবলম্বী বিভিন্ন হাদীস দ্বারা আপন মত প্রমাণিত করেছেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীস সমূহ একত্র করে দেখলে শেষোক্ত মতই প্রমাণ হিসাবে বলিষ্ঠ, দৃঢ় ও আমল যোগ্য বলে প্রতীয়মান হয়। (নাইলুল আওতার ৪র্থ খণ্ড ২২৪-২২৫ পৃষ্ঠা)

বর্তমান যুগে রেলগাড়ী এবং উড়োজাহাজ প্রভৃতির ন্যায় যানবাহন আবিষ্কারে সফর যত সহজ এবং ক্লেশমুক্ত হয়েছে তাতে রোযা পালনের শ্রেষ্ঠতাই প্রমাণিত হচ্ছে।

গর্ভবতী, ধাত্রী মাতার ও বৃদ্ধ-বৃদ্ধার রোযা

গর্ভবতী (حامل) এবং স্তন্যদানকারীগণ (مرضعة) যদি রোযা পালনে অসমর্থ হয় কিংবা যথাক্রমে গর্ভজাত ও ক্রোড়স্থ সন্তানের ক্ষতির আশংকা করেন, তবে তাদের জন্য রামাযানের রোযা ত্যাগ করবার অনুমতি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক প্রদত্ত হয়েছে। অর্থাৎ অন্য সময় তারা এর কাযা করবেন। তাদের প্রতি কোন কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না। (নাইলুল আওতার ৪র্থ খণ্ড ২৩০ পৃষ্ঠা)

বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাগণ যদি বার্ধ্যক্যের প্রকোপে রোযা পালনে অপারগ হন তবে তাদের জন্য রোযা পরিহার করার নির্দেশ আছে। কিন্তু প্রত্যেক রোযার পরিবর্তে এর কাফ্ফারা স্বরূপ একজন দারিদ্রের (মিসকিন) একদিনের আহার্য দ্রব্য ফিদইয়া প্রদান করতে হবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

যারা রোযা পালনে অসমর্থ তাদেরকে ফিদইয়া অর্থা একজন মিসকীনের একদিনের আহারের পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য প্রদান করতে হবে।
(সূরা ঃ আল-বাক্বারা ১৮৫ আয়াত)

ফিদইয়ার পরিমাণ

এক মিসকিনের আহারযোগ্য ফিদইয়ার পরিমাণ নির্ধারণে জ্ঞানীগণের মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) বলেছেন ঃ গমের অর্ধ সা এবং অন্যান্য খাদ্য বস্তুর পূর্ণ সা প্রদান করবে।

ইমাম শাফিয়ী (রহঃ) বলেছেন ঃ গমের এক সা এর চতুর্থাংশ অর্থাৎ আশি তোলা ওজনের দশ ছটাক তিন কাচ্চা পরিমাণ এবং অন্যান্য দ্রব্যাদি হতে অর্ধ সা অর্থাৎ একসের ছয় ছটাক পরিমাণ প্রত্যেক রোযার ফিদইয়া দিতে হবে। কেউ কেউ বলেছেন যে, কোন খাদ্যের অর্ধ সা প্রদান করা যাবে।

ওয়ালী মৃত ব্যক্তির কাযা রোযা রাখবে

কোন নর-নারী ইন্তিকাল করলে তার উপর আরোপিত ফরয রোযা সম্বন্ধে কি করতে হবে, এ সম্বন্ধে জ্ঞানী-সুধীগণের যে মতভেদ পরিলক্ষিত হয় তা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ঃ

প্রথমঃ আহলুলহাদীসগণ, শাফিয়ী মুহাদ্দিসীনগণ ও আবূ সওর এই মত অবলম্বন করেছেন যে, মৃত ব্যক্তির পক্ষ হতে তার ওয়ালী বা উত্তরাধিকারীগণ রোযা পালন করবে। অর্থাৎ কাযা করবেন। যে কোন রোযাই হউক না কেন। ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বলও উক্ত মত সমর্থন করেছেন। নিম্নে বর্ণিত হাদীস দ্বারা তারা প্রমাণ গ্রহণ করে থাকেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

من مات وعليه صيام صام عنه وليه *

যে ব্যক্তি মারা গেল এবং তার কাযা রোযা থাকল তার ওয়ালী সেই রোযা রাখবে। **(বুখারী, মুসলিম)**

বাক্যটি যদিও সংবাদসূচক কিন্তু এটা নির্দেশ বা আমলের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ ওয়ালীর সেই রোযা পালন করা কর্তব্য।

(নাইলুল আওতার ৪র্থ খণ্ড ২৩৬ পৃষ্ঠা)

বুখারী ও মুসলিম আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাসের (রাঃ) মারফত আরও বর্ণনা করেছেন যে, জনৈক স্ত্রীলোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞাসা করলেন, আমার মাতা মারা গেছেন এবং তার এক মাসের রোযা কাযা রয়ে গেছে। সেই রোযা তার পক্ষ হতে আদায় করা চলবে কি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ

বলত! যদি তোমার মাতার প্রতি কোন কর্জ (দেনা) থাকত তা কি তুমি পরিশোধ করতে না? স্ত্রীলোকটি বলল ঃ নিশ্চয়ই করতাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তবে আল্লাহর কর্জ অর্থাৎ কাযা রোযা আদায় করা একান্ত আবশ্যক। **(বুখারী, মুসলিম)**

দ্বিতীয়ঃ ইমাম মালিক, আবূ হানীফা ও অন্যান্য বিদ্বানগণের মতে রোযা রাখবেন, কিন্তু যদি অসিয়ত করে যায় তবে তার রোযার পরিবর্তে দারিদ্রগণকে আহার করাতে হবে। অসিয়ত ব্যতীত এটাও করবে না। ইমাম শাফিয়ীর পরবর্তী মতে এটাই বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু প্রথমোক্ত মতের প্রামাণ্য হাদীস সমূহ বিশ্বস্ত হওয়ায় শাফিয়ী বিদ্বানগণ তার পূর্ব মতকেই সঠিক বলেছেন। **(বুখারীর টিকা ২৬২ পৃষ্ঠা)**

তৃতীয়ঃ কতিপয় বিদ্বান বলেছেন ঃ যদি মৃত ব্যক্তির মানতকৃত রোযা হয় তবে তা কাযা করবে, নচেৎ নয়। কিন্তু জানা আবশ্যক যে, ২য় ও ৩য় মতের প্রমাণ কোন মারফু বিশ্বস্ত হাদীসে নেই। যা প্রয়োগ হয়ে থাকে এটা মওকুফ বা সাহাবাগণের (রাঃ) উক্তি মাত্র। উপরন্তু তা অবিশ্বস্ত, জয়ীফ। সুতরাং উপরোল্লিখিত বিশ্বস্ত মারফু হাদীসের মুকাবিলায় এটা গৃহীত হতে পারে না।

হায়েয ও নিফাস কালে মহিলাগণের রোযা

রামাযান মাসে হায়েয ও নিফাসধারী মহিলাগণ রোযা রাখবেন না, নামায পড়বেন না। অন্য যে কোন সময়ে রামাযানের রোযা কাযা (আদা) করবেন, কিন্তু নামায কাযা করতে হবে না। বিবি আয়িশা (রাঃ) কর্তৃক এইরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। **[তিরমিযী, বুখারী (আবূ সাঈদ খুদরী হতে)]**

কাযা রোযা রাখবার সময়

রামাযানের কাযা রোযা আদায় করার কোন সময় নির্দিষ্ট নেই। বরং বৎসরের যে কোন সময় এটা সমাধা করা যাবে। রামাযানের কাযা এক সাথে রাখা আবশ্যকীয় নয় বরং বিভিন্ন সময়ে উক্ত রোযা রাখা যাবে। মা আয়িশা (রাঃ) বলেছেন যে, আমার উপর রামাযানের রোযা কাযা থাকত। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপস্থিত থাকায় বা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে ব্যস্ততা হেতু সেই রোযা শাবান ব্যতীত অন্য মাসে আদায় করা আমার পক্ষে সম্ভব হত না।

(বুখারী)

ই'তিকাফ

বিদ্বানগণের এতে দ্বিমত নেই যে, ই'তিকাফ জায়িয ও অধিকাংশের মতে ই'তিকাফ সুন্নাতে মুয়াক্কাদা। মাসজিদে আল্লাহর উপাসনার জন্য বিশেষরূপে নির্জনে বাস এবং দুনিয়াদারির কার্যসমূহ হতে বিরত থাকাকে শারীয়াতের পরিভাষায় ই'তিকাফ বলা হয়। মা আয়িশা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত প্রত্যেক রামাযানের শেষ ভাগে ই'তিকাফ করেছেন। এক বৎসর কোন কারণবশত ই'তিকাফ করতে না পেরে পরের বৎসর তিনি বিশ দিন ই'তিকাফ করলেন। (তিরমিযী, নাইলুল আওতার ৪র্থ খণ্ড ৩৬৪ পৃষ্ঠা)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাধারণতঃ রামাযানের শেষ দশ দিনেই ই'তিকাফ করেছেন। তিনি যে সময়ে ই'তিকাফে প্রবেশ করেছেন, সেই সম্বন্ধে সুধীবৃন্দের মতভেদ আছে। ইমাম চতুষ্টয় বলেছেন, ই'তিকাফকারী বিশ তারিখের বিকালে মাসজিদে প্রবেশ করবে এবং মাসজিদের নির্দিষ্ট স্থান যা ই'তিকাফের জন্য তৈরী করা হয়েছে এর বাইরে অন্যত্র সেই রাত্রি যাপন করবে। এবং একুশ তারিখ ফজরের নামাযের পর সেই নির্দিষ্ট স্থানে প্রবেশ করবে। কেউ কেউ প্রভাত হতে এর সময় আরম্ভ হয় বলে মত প্রকাশ করেছেন। কিন্তু প্রথমত মতই বলিষ্ঠ।

(নাইলুল আওতার ৪র্থ খণ্ড ২৬৫ পৃষ্ঠা)

ই'তিকাফের জন্য রোযা শর্ত নয়। রোযা ছাড়াও ই'তিকাফ করা চলবে। বুখারী ও মুসলিম আয়িশা (রাঃ) ও উমার (রাঃ) কর্তৃক যে বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন– তাতে এটাই প্রমাণিত হয়–(বুখারী)। ই'তিকাফ কারীকে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি পালন করতে হবে।

(১) ই'তিকাফের সময় স্ত্রী-সঙ্গম নিষিদ্ধ। কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ

ولاتباشروهن وانتم عاكفون فى المساجد *

মাসজিদে ই'তিকাফ করার সময় তোমরা স্ত্রীগণের সাথে সঙ্গমে লিপ্ত হয়ো না। (সূরা ঃ আল-বাক্বারা আয়াত ১৮৭)

(২) মাসজিদের ভিতর হতে মাথা বের করতঃ স্ত্রীর দ্বারা এটা বিধৌত করান এবং মাথার কেশগুলো পরিপাটি করান নিষিদ্ধ নয়। (বুখারী)

(৩) মল মুত্র ত্যাগ ছাড়া অন্য কোন কাজের জন্য মাসজিদ পরিত্যাগ করবে না। এমন কি রোগী দেখা এবং (অন্য কোথাও) জানাযায় উপস্থিত হবে না। রাস্তা চলার সময় কোন রোগীর অবস্থা জিজ্ঞাসা করা নিষিদ্ধ নয়। (আবূ দাউদ, বুখারী)

(৪) স্ত্রী কিংবা অন্য কেউ যথাস্থানে সাক্ষাত করতে আসলে তাদের সাথে আলাপ-আলোচনা করলে ই'তিকাফ নষ্ট হবে না। আবশ্যক হলে সাক্ষাতকারীর সাথে কিছু দূর গমন করতে পারবে। (বুখারী)

(৫) স্ত্রীগণ তাদের স্বামীর সাথে সাক্ষাতের জন্য মাসজিদে গমন করতে পারবেন। মহিলার সাক্ষাতের সময় যদি অন্য কোন লোক দেখতে পায়, তবে তাকে সেই মহিলার পরিচয় দিয়ে তার সম্ভাব্য সন্দেহ দূরীভূত করা উচিত। বিবি সাফিয়ার (রাঃ) সাক্ষাতের সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুইজন আনসারী সাহাবীকে এইরূপ পরিচয় করিয়েছিলেন এবং বলেছেন ঃ শয়তান তোমাদের অন্তরে সন্দেহ ঢালতে পারে, তাই আমি এইরূপ করলাম। (বুখারী)

(৬) মহিলাগণ মাসজিদে কিংবা নিজ বাসর ঘরে ই'তিকাফ করতে পারবেন। (বুখারী)

শবে ক্বাদার বা ক্বাদার রজনী

যে মহিমান্বিত রজনীতে আল-কুরআনের অবতরণ আরম্ভ হয়েছে এবং যে রাত্রির গৌরবে রামাযান মাস গৌরবান্বিত হয়েছে সেই মহিয়সী রজনী শবে ক্বাদার বা লাইলাতুল ক্বাদার নামে অভিহিত।

লাইলাতুল ক্বাদার অর্থঃ আল-কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে বলে এটা অতি মহিমান্বিত রাত্রি; কিংবা ফেরেশতাগণ অবতরণ করেন, কিংবা এতে আল্লাহর করুণারাশি, কৃপা, ক্ষমা ও অনুকম্পা অবতীর্ণ হয়, তাই এটা মহিমান্বিত ও সম্মানীয়। কিংবা যিনি উক্ত রজনী উপাসনায় নিমগ্ন থেকে অনিদ্রায় কাটিয়েছেন, তিনি অতি মহৎ, তাই এটা লাইলাতুল ক্বাদার। কেউ কেউ বলেছেন, যেহেতু উক্ত রজনীতে সেই বৎসরের বিধিনিষেধ লিপিবদ্ধ করা হয় সেই জন্য এটা ক্বাদার রজনী; যেমন আল্লাহ বলেছেন ঃ

উক্ত রজনীতে প্রত্যেক বিষয়ের মূলনীতি বিশ্লেষিত হয়ে থাকে। এতেই ফেরেশ্‌তাগণ মানুষের বিস্তারিত ভাগ্যলিপি নির্ধারিত করে থাকেন।

(নাইলুল আওতার ৪র্থ খণ্ড ২৭১ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ

انا انزلناه فى ليلة القدر - وما ادراك ماليلة القدر- ليلة القدر خيرمن الف شهر - تنزل الملئكة والرح فيهاباذن ربهم من كل امرسلام - هى حتى مطلع الفجر *

নিশ্চয় আমি কুরআনকে লাইলাতুল ক্বাদারে অবতীর্ণ করেছি। হে নবী! লাইলাতুর ক্বাদার কী তা আপনি অবগত আছেন কি? এটা সহস্র মাস অপেক্ষা অধিক শ্রেয়। এতে ফেরেশ্‌তাগণ ও জিব্রাঈল (আঃ) তাদের প্রভুর আদেশে উষার আলো প্রকটিত হওয়ার পুর্ব পর্যন্ত সর্ববিষয়ের শান্তি নিয়ে অবতরণ করেন। **(সূরা ঃ আল-ক্বাদার)**

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

যে কোন মুমিন ব্যক্তি পুণ্যার্জন মানসে লাইলাতুল ক্বাদারে কিয়াম করবে অর্থাৎ নৈশ ইবাদতে লিপ্ত হবে তার পূর্ববর্তী পাপরাশি মার্জিত হবে।

(বুখারী, নাইলুল আওতার ২৭১ পৃষ্ঠা)

বুখারী ও তিরমিযী আয়িশা (রাঃ) কর্তৃক রিওয়ায়াত করেছেন– তিনি বলেন ঃ

যখন রামাযানের শেষ দশদিন উপস্থিত হত তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইবাদতের জন্য প্রস্তুত হতেন। রাত্রি জাগরণ করতেন এবং তার পরিজনকেও ইবাদতের জন্য উদ্বুদ্ধ করতেন।

শবে ক্বাদারের সময়

লাইলাতুল ক্বাদারের সময় ও দিন নির্ধারণে বিদ্বানগণের যথেষ্ট মতভেদ পরিদৃষ্ট হয়। আল্লামা হাফেয ইবনু হাজার বুখারীর টিকায় এর বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। আল্লামা শাওকানী নাইলুল আওতারে সংক্ষিপ্তভাবে পয়তাল্লিশটি মতের উল্লেখ করেছেন, তার মধ্যে আমরা তিনটি মতের উল্লেখ করছি।

১। এটা রামাযানের শেষাংশের সপ্তবিংশ বা সাতাইশা রজনী।

২। রামাযানের শেষাংশের বিজোড় রজনীসমূহের যে কোন রজনীতে এটা সংঘটিত হয়।

৩। শেষাংশের বিজোড় রজনীসমূহ এবং শেষ রাত্রের মধ্যে যে কোন এক নিশিতে এটা হয়ে থাকে।

হাফেয ইবনু হাজার ও আল্লামা শাওকানী এবং অন্যান্য অধিকাংশ বিদ্বানগণ দ্বিতীয় মতটিকে শ্রেষ্ঠ বলেছেন। বুখারী ও মুসলিম কর্তৃক আয়িশার (রাঃ) বাচনিক বর্ণিত হাদীসে এটাই প্রমাণিত হয়। বুখারী বর্ণিত শব্দ এরূপ– রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

তোমরা রামাযানের শেষ দশ দিনের বিজোড় রজনীতে লাইলাতুল ক্বাদার অন্বেষণ কর। **(বুখারী)**

উবাদা ইবনু সামিত (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে তৃতীয় মত প্রমাণিত হওয়ার সাথে সাথে দ্বিতীয় মতের বলিষ্ঠতাও প্রমাণিত হচ্ছে। উবাদা (রাঃ) বলেছেন ঃ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লাইলাতুল ক্বাদার সম্বন্ধে আমাদের অবহিত করেছেন, এটা রামাযান মাসের শেষাংশের একুশ,

তেইশ, পচিশ, সাতাইশ কিংবা উনত্রিশ রাত্রিতে সংঘটিত হয়। কিংবা রামাযানের শেষ নিশিতে। (তারগীব ১৮৫ পৃষ্ঠা)

প্রথম মতের প্রমাণেও হাদীস বর্ণিত হয়েছে। কতিপয় বিদ্বান (মতান্তরে অধিকাংশ বিদ্বানগণ) উক্ত মত পোষণ করেছেন। কিন্তু প্রকৃত কথা এই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে প্রথমে নির্দিষ্ট ভাবে এর তারিখ জানিয়ে দেওয়া হয়; পরে এটা অজানা হয়ে যায়। অতএব, রামাযানের শেষাংশের বিজোড় রাত্রি সমূহে এটা লাভ করার চেষ্টা করা উচিত। (বুখারী)

যাতে মুসলমানগণ উক্ত কয়েক রাত্রিতেই ইবাদতে লিপ্ত হয়ে সেই নির্দিষ্ট মহিমান্বিত রাত্রির মর্যাদা লাভ করে, সেজন্য এর স্পষ্টতা ও নির্দিষ্টতা গোপন করা হয়েছে। অতএব, কোন এক রাত্রিকে নির্দিষ্টভাবে গ্রহণ করা এবং অন্য রাত্রিতে গাফিল থাকা উচিত নয়।

ক্বাদার রাত্রিতে নিম্নলিখিত দু'আ পাঠ করবে। (নাইলুল আওতার ২৭১ পৃষ্ঠা)

اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنى *

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নাকা 'আফুউ্উন তুহিব্বুল্ আফওয়া ফা'ফু 'আন্নী।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! অবশ্যই তুমি ক্ষমাশীল, তুমি ক্ষমা করাকে ভালবাস, অতএব, তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও। (তিরমিযী, ইবনু মাজাহ)

পরিতাপের বিষয় মুসলমানের মধ্যে অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় ইবাদত অর্চনায় নানারূপ রসম রিওয়াজ ও নতুন নতুন মত সৃষ্টি হয়ে গেছে। পক্ষান্তরে এর প্রতিকুল কোন আলোচনা তাদের নিকট গোনাহে কবীরা তুল্য। অতএব, সেই কুসংস্কার প্রতিপন্ন করার জন্য হাদীস জাল করতেও তারা কুণ্ঠিত হয়নি। আমাদের দেশে বহুল প্রচলিত মাযহাবে পরিদৃষ্ট হয় যে, ক্বাদার ও বরাতের পুণ্যময় রাত্রিদ্বয়ে অজ্ঞ জনসাধারণকে একটি নির্দিষ্ট সংখ্যার নামাযের আদেশ করা হয়।

অতএব, শ-পঞ্চাশের ধাঁধাঁয় পড়ে জনসাধারণ উক্ত রজনীদ্বয়ের পুণ্য লাভের পথ খুঁজে পায় না। শারীয়াত প্রবর্তক মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে এরূপ নির্দিষ্ট সংখ্যক নামাযের কোন বিশ্বস্ত

প্রমাণ নেই। উক্ত রজনীদ্বয়ে একশত বা পঞ্চাশ রাকা'আত বলে কোন নির্দিষ্ট নামায নেই এবং এতে যে কোন রূপে ইবাদত অর্চনায় লিপ্ত থেকে নিশি জাগরণ করে প্রভুর রহমত ও সন্তুষ্টি লাভের চেষ্টা করাই উচিত।

হানাফী মাযহাবের মুল্লা আলী কারী হানাফীর (রহঃ) একটি বিবৃতি উদ্ধৃত করে এই প্রসঙ্গের উপসংহার করব।

তিনি মিশকাতের শরাহ্ মিরকাতে বলেছেন ঃ

"অবগত হওয়া আবশ্যক যে, 'লাআলী' পুস্তকে উল্লিখিত দয়লমী প্রভৃতি কর্তৃক বর্ণিত শাবানের পনেরই রাত্রি বা শবে বরাতে একশত রাকা'আত নামায প্রত্যেক রাকা'আতে দশবার করে সূরা ইখলাসসহ অত্যধিক দীর্ঘতার সাথে ইত্যাদি বর্ণনা সমূহ মাওযূ বা প্রক্ষিপ্ত (জাল)। অন্য পুস্তকে আছে, আলী ইবনু ইব্রাহিম বলেছেন, শবেবরাতের বিদ'আত সমূহের অন্যতম আলফিয়া নামায, এটা একশত রাকা'আত দশ দশ বার সূরা ইখলাস قل هوالله সহ জামা'আতের সাথে এবং জুমুআ ও ঈদের নামায অপেক্ষা এর অধিক গুরুত্ব প্রদত্ত হত। এ সম্বন্ধে যে হাদীস বা আসার বর্ণিত হয়েছে তা সর্বতঃ মিথ্যা, মাওযূ বা অধিক দুর্বল। ইহইয়াউল উলুম কিতাবুল কুতে উল্লিখিত হওয়ায় ধোঁকায় পড়া উচিত নয়। এতে জনসাধারণ জঘন্য ফিৎনায় পতিত হয়েছে। আহার বিহারের আশ্রয় নিয়ে অনেক নিষিদ্ধকার্যে লিপ্ত হয়ে শারীয়াতের বিধান লঙ্ঘন করেছে, অনাচার ও অবিচার চরমে উঠেছে; যা প্রকাশ করা সম্ভবপর নয়। এর কুফলে ভূমিস্মাতের আশংকা করে আওলিয়াগণ জঙ্গলাভিমুখে পলায়ন করতঃ আত্মরক্ষায় চেষ্টিত হয়েছেন। এই বিদ'আত সন ৪৪৮ হিজরীতে সর্বপ্রথম জেরুজালিমে-বাইতুলমুকাদ্দাসে আবিষ্কৃত হয়। মাসজিদের অজ্ঞ ইমামগণ অন্যান্য নামাযের সাথে যুক্ত করে এই নামায দ্বারা জনসাধারণকে একত্রিত করার একটি ফন্দি এঁটেছিল। এর উদ্দেশ্য সর্দার হওয়া এবং উদর পূর্ণ করা ছাড়া কিছুই ছিল না।" **(মিরকাত ২য় খণ্ড ১৭৮ পৃষ্ঠা)**

উপরোল্লিখিত নামাযের পূর্ণরূপ যদিও বর্তমানে নেই কিন্তু ওরই এক প্রকার সংস্কারকপ্রাপ্ত রূপ অদ্যাবধি বিদ্যমান। এতে জনসাধারণের চৈতন্য উদয় হলে এবং এর প্রকৃত জ্ঞান-লাভ করলে আমার পরিশ্রম সার্থক হবে।

ঈদ উৎসব

মুসলমানগণের উৎসবের জন্য ইসলাম ধর্মে দুইদিন স্বীকৃত হয়েছে। প্রথম ঈদুল ফিতর, দ্বিতীয় ঈদুল আযহা– রোযার ঈদ ও বক্‌রা ঈদ। প্রত্যেক বৎসর নব নব উল্লাসে নতুন আনন্দের বার্তা বহন করে আনে বলেই উক্ত দিবসকে ঈদ বলা হয়।

এই দিবসের ইতিকর্তব্য সম্পর্কে নিম্নে কতিপয় হাদীস উল্লেখ করা অপ্রাসাঙ্গিক হবে না। ইসবাহানী আবূ হুরাইরা (রাঃ)-এর বাচনিক বর্ণনা করেছেন, ঈদুল ফিত্‌রের পূর্ব রাত্রে ফেরেশ্‌তাগণের অন্তরে উঠে আনন্দের উল্লাস। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, হে ফেরেশ্‌তাগণ। দীন মজুর তার কার্য সমাপ্ত করলে তার সাথে কি ব্যবহার করা উচিত? ফেরেশতাগণ বলবেন ঃ পূর্ণ পারিশ্রমিক প্রদান করাই বাঞ্ছনীয়। অতঃপর ফেরেশতাগণকে সাক্ষ্য করে আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি উম্মাতে মুহাম্মদীয়ার রোযাদার ব্যক্তিদের পাপরাশি সম্পূর্ণরূপে ক্ষমা করে দিলাম।

(আততারগীব ২য় খণ্ড ২২১ পৃষ্ঠা)

বাইহাক্বী ইবনু আব্বাস কর্তৃক বর্ণনা করেছেন, ঈদুল ফিত্‌র রজনী ফেরেশতাগণের নিকট লাইলাতুল জায়িযাহ– পারিতৌষিক প্রদানের রাত্রি নামে পরিচিত। **(আত তারগীব)**

যারা উক্ত রজনীতে ইবাদত করবে তারা পরকালে শান্তিনিকেতন– বেহেশতে বাস করবে। **(আত তারগীব ২য় খণ্ড ২২৩ পৃষ্ঠা)**

ঈদের দিন প্রাতে ঈদের মাঠের চতুষ্পার্শ্বে ফেরেশতাগণ দলেদলে রাস্তার মাথায় দাঁড়িয়ে মাঠে আগন্তুক মুসল্লীদিগকে অভ্যর্থনা করেন এবং রোযার পারিশ্রমিক গ্রহণ করতে আহ্বান জানান। ঈদের নামায শেষ হলে তারা বলেন, মুসলিমগণ আপনারা পাপশূন্য হয়েছেন, এখন উৎফুল্লচিত্তে পুণ্যের বোঝা বহন করে আপন গৃহে প্রত্যাবর্তন করুন। আল্লাহ তা'আলা বলবেন ঃ হে ফেরেশতাগণ তোমরা সাক্ষী থাক, আমি তাদের কার্যে সন্তুষ্ট হয়েছি এবং আমার সন্তুষ্টিও তাদেরকে প্রদান করেছি। পুনরায় ধ্বনি হবে, হে আমার দাসদাসীগণ। আমার কাছে চাও, আমার সম্মান, প্রতাপ ও মহিমান্বিত নামের শপথ করে বলছি আজ তোমরা দুনিয়া ও আখিরাতের

জন্য যা প্রত্যাশা করবে, প্রদান করব। আমার রহমতের পানি দ্বারা তোমাদের পাপরাশি বিধৌত করলাম– তোমরা পাপমুক্ত হয়ে স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাবর্তন কর। **(আত্ তারগীব ২য় খণ্ড ২২৩ পৃষ্ঠা)**

আল্লাহ্ তা'আলা ঈদ রজনীতে রামাযানের সমস্ত মাস অপেক্ষা অধিক সংখ্যক নরকীকে আযাদ করেন। **(আত্ তারগীব ২য় খণ্ড ২২৩ পৃষ্ঠা)**

ফিত্‌রা বা যাকাতুল ফিত্‌র

আমরা মানুষ। ত্রুটি বিচ্যুতি মানুষের সহজাত। রোযা রাখার সময় আমাদের নানা ত্রুটি হয়ে থাকে। অতএব, সেই সমস্ত ত্রুটি-বিচ্যুতি হতে রোযাদারকে পবিত্র করার জন্য এবং দীনদুঃখীদের আহার যোগান মানসে অর্থাৎ মুসলিম সমাজের অর্থনৈতিক বৈষম্য বিদূরিত করণার্থে পরম করুণাময় আল্লাহ তা'আলা তার রাসূলের মুখে যাকাতুল ফিত্‌র বা ফিত্‌রার আবশ্যকতা এবং ফরযিয়াত ঘোষণা করে দিয়েছেন।

বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ প্রভৃতি আবদুল্লাহ্ ইবনু উমার ও আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাসের (রাঃ) প্রমুখাৎ রিওয়ায়াত করেছেন ঃ

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফিত্‌রাকে ফরয করেছেন। **(বুখারী)**

বুখারীর অন্য বর্ণনাতে আছে, ফিত্‌রা প্রদানের জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশ দিয়েছেন।

ফিত্‌রা পরিশোধ না করা পর্যন্ত রোযা আকাশ পাতালের মধ্যে ঝুলান থাকে। অর্থাৎ এটা আল্লাহর নিকট গৃহীত হয় না।

বাহ্যিক দৃষ্টিতে ফিত্‌রা

পাঠক ও পাঠিকা! কত শত দরিদ্র মুসলমান ভাই ভগ্নিগণ অনাহারে অর্ধাহারে কাল যাপন করছে; রোযার মাস অতি কষ্টে কাটাচ্ছে। আজ ঈদের (খুশির) দিন। মুসলিম সমাজের ঘরে ঘরে আনন্দের ফোয়ারা ছুটেছে, আনন্দোল্লাসে তাদের মন মেতে উঠেছে। তাদের ছেলেমেয়েরা

আহ্লাদে গান গাচ্ছে, হাসছে, খেলছে ও দুলছে। কিন্তু তাদেরই মত হতভাগা নরনারী দীন-দুঃখী শিশু সন্তানদের আর্তনাদ ও করুণ ক্রন্দনে গগণ-পবন ধ্বনিত হচ্ছে, এমন উৎসবের দিনেও তারা বিলাপ করছে। মালদারের সন্তানেরা হাসছে এবং তাদের সন্তানগণ বিলাপ করছে। জাতির এই বৈষম্য বিদূরিত করে উভয় দলের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করার প্রয়োজন ছিল। দীনদুঃখীদের আর্তনাদ যাতে অন্ততঃ সাময়িকভাবেও উপশমিত হয়ে আহ্লাদে পরিবর্তিত হতে পারে সেই ব্যবস্থা করা অত্যাবশ্যক ছিল। তাই সনাতন ধর্ম ইসলাম প্রবর্তক মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানের প্রতি যাকাতুল ফিত্র বা ফিত্রার ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করলেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোযাদারের ত্রুটি বিচ্যুতির শুদ্ধি এবং দরিদ্রগণের আহারের জন্য যাকাতুল ফিত্র বা ফিত্রাকে ফরয করেছেন। **(আবূ দাউদ, নাইলুল আওতার)**

ফিত্রা কাদের উপর এবং কিসের দ্বারা

প্রত্যেক মুসলমান স্ত্রী-পুরুষ আবাল বৃদ্ধ-বনিতা আযাদ ও দাসী যাদের ঘরে একদিনের আহার্য অপেক্ষা বেশী ফিত্রা প্রদানের যোগ্য দ্রব্যাদি থাকে তাদের প্রতি ফিত্রা ফরয। **(রাওযাতুন্নাদিইয়াহ ১৩১ পৃষ্ঠা)**

বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ, তিরমিযী ও মুয়াত্তা প্রভৃতি হাদীস গ্রন্থে আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাস ও স্বাধীন, পুরুষ এবং স্ত্রী, ছোট ও বড় প্রত্যেক মুসলমানের প্রতি ফিত্রা ফরয করেছেন ঃ

বুখারীর অন্য বর্ণনাতে আছে– "প্রত্যেক স্বাধীন কিংবা দাস, পুরুষ ও স্ত্রী প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ফিত্রা ফরয।" আবূ দাউদের অন্য রিওয়ায়াত প্রত্যেক মুসলমানের প্রতি ফিত্রা ফরয করেছেন।

মুসলিমের এক বর্ণনাতে মুসলমানের প্রত্যেক ব্যক্তি বিশেষের প্রতি ফিত্রা ফরয বর্ণিত হয়েছে।

ইবনু খুযাইমা ও দারাকুতনী প্রভৃতি ইবনু আব্বাসের (রাঃ) বাচনিক উক্ত মর্মের মারফূ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ প্রত্যেক স্ত্রী-পুরুষ, ছোট-বড় ধনী ও দরিদ্রের জন্য ফিত্‌রা প্রদান করা একান্ত প্রয়োজন (কর্তব্য)। যারা সম্পত্তিশালী আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সম্পত্তি বর্ধিত করবেন। এবং যারা দরিদ্র আল্লাহ্ তা'আলা তাদের ফিত্‌রা অপেক্ষা অধিক তাদেরকে প্রত্যাবর্তন করে দিবেন। **(আবূ দাউদ, আহমাদ)**

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত– তিনি বলেছেন ঃ

যখন আমাদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদ্যমান ছিলেন তখন আমরা যাকাতুল ফিতর এক সা খাবার বা এক সা যব বা এক সা খেজুর অথবা এক সা পনীর অথবা এক সা কিশমিশ প্রদান করতাম। **(বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী)**

তাআম 'শব্দ' কোন দ্রব্য বিশেষের উপর প্রযোজ্য হয়নি। এতে কোন নির্দিষ্ট দ্রব্য মনে করা উচিতও নয়। কারণ বুখারী আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) কর্তৃক বর্ণনা করেছেন– তিনি বলেছেন ঃ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সময়ে আমরা ফিত্‌রা দিবসে এক সা তাআম ফিত্‌রা বের করতাম। তিনি আরো বলেছেন ঃ সেই সময় যব, কিশমিশ, পনীর, খেজুর, আমাদের তা'আম ছিল। **(বুখারী)**

উপরোক্ত দ্রব্যাদি ব্যতীত খোসাহীন যব জাতীয় খাদ্য মূলত, গম, আটা ও ছাতুর নাম কোন কোন হাদীসে স্পষ্ট পাওয়া যায়। আটা ও ছাতু সম্বন্ধে যে হাদীস বর্ণিত হয়েছে তা দারাকুতনী, আবূ দাউদ প্রভৃতি আবূ সাঈদ খুদরীর (রাঃ) বাচনিক রিওয়ায়াত করেছেন, কিন্তু বর্ণনা সম্বন্ধে আবূ দাউদ (রঃ) বলেছেন, বর্ণনার অন্যতম রাবী সুফিয়ান ইবনু উইয়াইনার ভুলে এই হাদীসে আটার নাম যুক্ত হয়েছে। **(আবূ দাউদ)**

ইবনু খুযাইমা ইবনু আব্বাসের (রাঃ) প্রমুখাৎ আটার হাদীস বর্ণনা করেছেন, কিন্তু আবূ হাতীম উক্ত বর্ণনাকে মুনকার (অপছন্দনীয়) বলেছেন, যেহেতু এর সনদ বিচ্ছিন্ন। ইবনু সিরীনের ইবনু আব্বাসের (রাঃ) নিকট শ্রবণ প্রমাণিত হয়নি। **(নাইলুল আওতার)**

অতএব, আটা এবং ছাতুর হাদীস গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। গম ও খোসাহীন যব জাতীয় দ্রব্যের হাদীস বিশ্বস্ত ও কোনটি বিচ্ছিন্নভাবে বর্ণিত

হয়েছে। কিন্তু যব, পনীর, খেজুর ও কিশমিশ ও তা'আমের হাদীসগুলি (বিশ্বস্ত) বিশুদ্ধ এবং সেগুলি সম্বন্ধে কোন দিক দিয়ে কোন ত্রুটি বিদ্বানগণ ধরতে পারেননি। এতে উল্লেখিত তা'আম শব্দের অর্থ ব্যাপক, অর্থাৎ যা খাওয়া যায়, যা খেয়ে মানুষ জীবন ধারণ করে যেমন যব, গম, খেজুর অন্যান্য সমুদয় দ্রব্য যা ভক্ষণ করে মানুষ বেঁচে থাকে এর জন্য তা'আম শব্দ ব্যবহার হয়ে থাকে। অতএব, যে দেশে যা প্রধান খাদ্য তা দ্বারা ফিত্‌রা দেওয়া জায়িয। আল্লামা শাওকানী বলেছেন ঃ

هی صا ع من القوت المعتاد *

ফিত্‌রা স্থানীয় সাধারণ আহার্য– প্রধান খাদ্য (যেমন– আমাদের দেশে চাউল) হতে এক সা বের করতে হবে। (রাওযাতুন্নাদিয়াহ ১৪০ পৃষ্ঠা)

ইমাম মালিক (রঃ), ইমাম শাফিয়ী (রঃ) ও ইমাম আহমাদ (রঃ) বলেছেন ঃ

চীনা,. বাজরা, চাউল এবং খোসাহীন যব জাতীয় দ্রব্যাদির মধ্যে যে অঞ্চলে যা প্রধান খাদ্য সেই অঞ্চলে তার দ্বারা ফিত্‌রা বের করা জায়িয।

ইমাম শাফিয়ী (রঃ) বলেন ঃ দানা (হাব্বা) দ্বারাই ফিত্‌রা আদায় করা উচিত। ইমাম আহমাদের (রঃ) নিকট সকল প্রকার দানা ও ফল যা মানুষের খাদ্য, তা দ্বারা ফিত্‌রা বের করা জায়িয। ইমাম মালিক বলেছেন, যে শহরের লোকের যা প্রধান খাদ্য তারা তদ্বরা ফিত্‌রা প্রদান করবে।

(ইলমুল মুওয়াক্কিয়ীন ৩য় খণ্ড ৩৪ পৃষ্ঠা)

বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ, তিরমিযী ও মুআত্তা (রঃ) প্রভৃতি কর্তৃক পূর্বোল্লিখিত হাদীসের সাহায্যে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হল যে, ফিত্‌রা প্রদানের জন্য নিসাব অর্থাৎ যাকাত প্রদানের যোগ্য হওয়া শর্ত নয়। বরং প্রত্যেক ধনী ও নির্ধন নির্বিশেষে ফিত্‌রা প্রদান করতে হবে। বাড়ীর কর্তা তার অধীনস্থ্ সকলের ফিত্‌রা প্রদান করবে যাদের সে ভরণ-পোষণ করে থাকে। যদি তাদের নিজস্ব মাল থাকে তবে সে মাল হতে প্রদান করবে। তা না হলে নিজের মাল হতে প্রদান করবে।

(মুআত্তা ১২৩ পৃষ্ঠা, রাওযাতুন্নাদিয়াহ ১৪০ পৃষ্ঠা)

আটা ও ময়দা, রুটি এবং এর মূল্য প্রদান করার কোন বিশ্বস্ত প্রমাণ নাই। সুতরাং তা নাজায়িয।

সা-এর পরিমাণ

এতে দ্বিমত নেই যে, গম ছাড়া অন্য সমুদয় দ্রব্যাদি হতে এক সা ফিত্‌রা প্রদান করতে হবে। গমের অর্ধ সা যথেষ্ট বলে কেউ কেউ বলেছেন। কিন্তু এক সা প্রদানের অভিমতটিই শক্তিশালী। এক সা হওয়াতে একমত হওয়ায় সা এর পরিমাণ নির্ধারণে মতানৈক্য হয়েছে।

ইমাম আবূ হানীফা (রঃ) এবং অন্যান্য ইরাকী বিদ্বানগণ বলেছেন– সা এর পরিমাণ আট রতল। এক রতল আধসের পরিমাণ হয়। এই হিসাবে সা হয় চার সের পরিমাণ।

দুররুলমুখতার প্রণেতা বলেছেন ঃ গ্রহণীয় সা এই যে, যাতে মাশকালাই কিংবা মশুর হতে এক সহস্র এবং চল্লিশ দিরহাম সঙ্কুলান হতে পারে।

পক্ষান্তরে, ইমাম মালিক (রঃ) ও শাফিয়ী (রঃ) ইত্যাদি ইমামগণ এবং মুহাদ্দিসীনগণ বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সা এর দ্বারা ফিত্‌রা প্রদান করেছেন, তার পরিমাণ ইরাকী সোয়া পাঁচ রতল। অর্থাৎ বর্তমান আশি তোলা ওজনের দুই সের এগার ছটাকের মত হয়। এতে মদীনাবাসী কদাচ মতভেদ করেননি যে, হিজাযী সা এর পরিমাণ ইরাকী পাঁচ রতল এবং এক তৃতীয়াংশ রতলই ছিল এবং এর দ্বারা সকলেই রামাযানের যাকাত অর্থাৎ ফিত্‌রা প্রদান করেছেন।

অতঃপর ইমাম মালিক বললেন ঃ

انا حزرت هذه فوجدتها خمسة ارطال وثلثا *

আমি স্বয়ং পরীক্ষা করে দেখেছি যে, এটা পাঁচ রতল ও তৃতীয়াংশ রতল অর্থাৎ পৌনে তিন সের পরিমাণ। **(নাইলুল আওতার ৪র্থ খণ্ড ১৮৫ পৃষ্ঠা)**

অতএব, এটাই বিশ্বস্ত এবং এই পরিমাণ ফিত্‌রা প্রদান করাই যথেষ্ট। **(রাওযাতুন্নাদিইয়াহ ১৪১ পৃষ্ঠা)**

ঈদের দুই তিন দিবস পূর্ব হতে প্রথম শাওয়ালের ঈদগাহে রওনা হওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত ফিত্‌রা প্রদান করা জায়িয হবে।

বুখারী নাফি' (রঃ)-এর বাচনিক রিওয়ায়াত করেছেন, নাফি' (রঃ) বলেছেন ঃ

যার নিকট ফিত্‌রা জমা হত সাহাবাগণ (রাঃ) তার নিকট ঈদের দুই দিন পূর্বে ফিত্‌রা প্রদান করতেন। **(বুখারী)**

ফিত্‌রা প্রদানের শেষ সময় নিয়ে বিদ্বানগণ মতবিরোধ করেছেন। কিন্তু সঠিক সিদ্ধান্ত এই যে, ঈদের নামাযে বহির্গত হওয়ার পরে ফিত্‌রা প্রদান করাকে বিলম্বিত করার বৈধতা প্রমাণিত হয়নি। বরং এর বিরুদ্ধে বিশ্বস্ত প্রমাণ রয়েছে যে, ফিত্‌রা ঈদগাহে বা ঈদের নামাযে বহির্গত হওয়ার পূর্বে পরিশোধ করতেই হবে। বিলম্বে ফিত্‌রা আদায় হবে না।

বুখারী আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রাঃ) কর্তৃক বর্ণনা করেছেন ঃ

ঈদের নামাযে লোকেরা বাহির হওয়ার পূর্বে ফিত্‌রা প্রদান করার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশ দিয়েছেন। অন্য বর্ণনাতে এইরূপ আছে–

হাকীম আবূ দাঊদ, দারাকুতনী ও ইবনু মাজাহ প্রভৃতি আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাসের (রাঃ) মারফত বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

যে ব্যক্তি ঈদের নামাযের পূর্বে ফিত্‌রা আদায় করে তার দান ফিত্‌রা রূপেই গ্রাহ্য হবে। আর যে ব্যক্তি ঈদের নামাযের পর প্রদান করবে তার দান সাধারণ সদকার অন্তর্ভুক্ত হবে। **(নাইলুল আওতার ৪র্থ খণ্ড ১৮৪ পৃষ্ঠা)**

অর্থাৎ ফিত্‌রারূপে গৃহীত হবে না। হাকীম এই হাদীসকে বিশুদ্ধ বলেছেন সুতরাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর স্পষ্ট নির্দেশমত ফিত্‌রাকে ঈদের নামাযের পূর্বেই প্রদান করা উচিত।

ঈদ দিবসে জ্ঞাতব্য বিষয়াদি

ঈদের দিন প্রাতে গোসল করতঃ নতুন কাপড় পরবে, না থাকলে পরিষ্কার করে পুরাতন কাপড়গুলো পরবে, সুগন্ধি আতর কিংবা তেল ব্যবহার করবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদ দিবসে উৎকৃষ্ট বস্ত্রাদি পরিধান করতেন। **(যাদুল মা'আদ)**

রোযার ঈদের নামাযে বাহির হওয়ার পূর্বে কিছু ভক্ষণ করা সুন্নাত।

খেজুর খেলে বেজোড় খাওয়াই উত্তম। আবার বকরা ঈদে কিছু না খেয়ে যাওয়াই সুন্নাত। কুরবানী করা পর্যন্ত উপবাস থেকে কুরবানীর গোশ্ত দ্বারা ইফতার করাই ভাল। **(বুখারী, তিরমিযী, যাদুল মা'আদ)**

ঈদের নামায খোলামাঠে ঈদগাহে পড়া সুন্নাত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদের নামায সর্বদা মাঠেই পড়তেন। কোন কারণ বশত মাসজিদেও পড়া যেতে পারে। বৃষ্টির জন্য এক বৎসর মাসজিদেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায সমাধা করেছেন।
(আবূ দাউদ, ইবনু মাজাহ, নাইলুল আওতার)

রোযার ঈদে মাঠে যাওয়ার সময় এবং বকরা ঈদে চন্দ্রোদয়ের পরই বিশেষভাবে নয় তারিখের প্রভাত হতে ত্রয়োদশ তারিখের আসর পর্যন্ত অর্থাৎ আইয়ামে তাশ্‌রীক সমূহে বিশেষভাবে উক্ত দিবসের ফরয নামাযের পর নিম্নলিখিত তাকবীর পাঠ করবে।

الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر كبيرا *

আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার কাবীরা
(রওযাতুন্নাদিইয়াহ ৯৬ পৃষ্ঠা)

অথবা এই তাকবীর পড়বে ঃ

الله اكبر، الله اكبر، لا اله الاالله، الله اكبر ، الله اكبر، ولله الحمد *

আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার ওয়া লিল্লাহিল হামদ।

অর্থাৎ আল্লাহই সর্বোচ্চ, তিনি ব্যতীত প্রকৃতপক্ষে কোন উপাস্য নেই এবং তাঁর জন্যই যাবতীয় প্রশংসা।

ঈদের মাঠে মিম্বর নিয়ে গমন করা নিষিদ্ধ। **(বুখারী)**

কিন্তু ঈদগাহে মিম্বর নির্মিত থাকলে তাতে দাঁড়িয়ে খুতবা প্রদান করা অবৈধ নয়। **(যাদুল মা'আদ)** ঈদের নামাযের পূর্বে আযান ও ইকামাত, ফরয ও নফল নামায নেই। **(বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী)**

নামাযের পূর্বে খুতবা প্রদান করা বনুউমাইয়াগণের আবিষ্কৃত বিদ'আত। **(যাদুল মা'আদ, তিরমিযী, মুসলিম)**

ঈদের নামায সূর্যোদয় হতে দ্বিপ্রহর পর্যন্ত সমাধা করা জায়িয। কিন্তু বকরাঈদের নামায দ্রুত এবং রোযার ঈদের নামায কিছু বিলম্বে পড়া উচিত। সূর্য এক নিযা বা এক নল পরিমাণ উপরে উঠলে ঈদুল আযহার নামায এবং দুই নিযা বা দুই নল পরিমাণ উপরে উদিত হলে ঈদুল ফিতরের নামায রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমাধা করতেন। **(আহমাদ, নাইলুল আওতার ৩য় খণ্ড ২৯৩ পৃষ্ঠা)**

মুসলিম মহিলাগণ ঈদের মাঠে নামাযে,যোগদান করবেন। বৃদ্ধা, যুবতী, ছোট, বড়, পর্দানশীন সকলেই উপস্থিত হবেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকলকে বের করার জন্য উম্মু আতিয়াকে নির্দেশ দিয়েছিলেন। এমনকি রক্তস্রাবধারী মহিলাগণও উপস্থিত হবেন। যাদের উড়নী বা চাদর নাই তারা অন্য মহিলার চাদরে আবৃত করে রওনা হবে। **(বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী)**

পরিতাপের বিষয় এই যে, বর্তমান জ্ঞান বিকাশের যুগে এই সুন্নাত সর্বোতভাবে পরিত্যাক্ত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলার উপাসনার জন্য মুসলিম মহিলাদের পূর্ণ পর্দার সাথে উপাসনালয়ে কিংবা ঈদের মাঠে গমন করা যা কিতাব ও সুন্নাত, দ্বারা প্রতিপাদিত, তা আমাদের সমাজে নিষিদ্ধ। অথচ এমন কোন স্থান নেই যেখানে মুসলিম মহিলা বৃদ্ধা ও যুবতীগণের পদার্পণ হয় নাই। বিশেষভাবে এই নারী স্বাধীনতার যুগে হাটে ও ঘাটে বাজারে ও বিপনীতে, পার্কে ও মাঠে, এমন কি চরিত্র নাশক থিয়েটার বায়স্কোপেও মুসলিম রমণীদের অভাব নেই। উপরন্তু এরূপ সাজ-সজ্জায় সজ্জিত হয় যে, যা দৃষ্টে যুবক কেন, বৃদ্ধেরও দৃষ্টি আকৃষ্ট না হয়ে পারে না এবং এর কুফল স্বরূপ মুসলিম কূল জননীদের দুর্বলাবস্থা ও ইজ্জত লুণ্ঠনের সংবাদ দৈনন্দিন শুনা যাচ্ছে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও মুসলিম সমাজ এই ধরনের সাজ-সজ্জার বিরুদ্ধে কোন কার্যকরী পন্থা অবলম্বন করেননি। অথচ সাধারণ বেশে সুগন্ধি ব্যবহার না করে পর্দার আড়ালে থেকে আল্লাহর ইবাদত করতে মাসজিদে কিংবা ঈদগাহে গমন করা মুসলিম সমাজ বরদাশত করতে পারে না। বিশ্ববাসীর মঙ্গলকামী শিক্ষাগুরু আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রক্তস্রাবধারী মহিলাগণ ও পর্দানশীন যুবতীগণকে ঈদের মাঠে যেতে নির্দেশ দিয়েছিলেন; স্রাবধারী মহিলাগণ নামায হতে দূরে থাকবেন। **(বুখারী, মুসলিম, ইবনু মাজাহ, তিরমিযী)**

ঈদের মাঠে নামাযের সময় ইমামের সম্মুখে অর্ধ হস্ত উচু (লাঠি বা) যে কোন দ্রব্য মাটিতে পুঁতে রাখবে। এটাকে সুতরা বলা হয়ে থাকে।

ঈদের নামাযের পূর্বে আযান ও ইকামাত নেই, নফল নামায ইত্যাদিও নিষিদ্ধ। **(বুখারী, মুসলিম)**

ঈদের দিন যে রাস্তায় ঈদগাহে গমন করবে সে রাস্তায় প্রত্যাবর্তন না করে অন্য পথে প্রত্যাবর্তন করবে। **(বুখারী, তিরমিযী, দারেমী)**

ঈদের নামাযে ১২ বার তাকবীর বলবে। প্রথম রাকা'আতে তাহরীমার তাকবীর ব্যতীত সাত তাকবীর এবং দ্বিতীয় রাকা'আতে কিরা'আত আরম্ভ করার পূর্বে পাঁচ তাকবীর (الله اكبر –আল্লাহু আকবার) বলবে। এটাই বিশ্বস্ত ও বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। অধিকাংশ ইমামগণের এটাই অভিমত। হানাফী মাযহাবের ইমামদ্বয় আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মাদ এই মতই পোষণ করতেন ও আমল করতেন। পক্ষান্তরে ছয় তাকবীর সম্বলিত বর্ণনাগুলো যয়ীফ– দুর্বল। উক্ত বর্ণনাতে একাধিক রাবী যয়ীফ। তাদের হাদীস গহণযোগ্য নয়। সূতরাং এর দ্বারা (ছয়তাকবীর) প্রমাণ করা যাবে না।

(তুহফাতুল আহওয়াযী ১ম খণ্ড ৩৭৮ পৃষ্ঠা, যাদুল মা'আদ ১ম খণ্ড ১২৫ পৃষ্ঠা)

নামায শেষে ইমাম খুতবা প্রদান করবে এবং মুক্তাদিগণ তা শ্রবণ করবে। জুমু'আর ন্যায় ঈদের নামাযে দুই খুতবাই প্রদান করবে। তাতে খতীব আল্লাহর ভয় প্রদর্শন ও ঈদের কর্তব্যাদি শ্রোতাবৃন্দকে জ্ঞাত করিয়ে নসিহত করবেন। **(বুখারী, মুসলিম)**

ঈদের নামাযের শেষে দুইটি খুতবা প্রদান করবে। প্রথম খুতবা শেষ করে কিছুক্ষণ বিশ্রাম গ্রহণ করত ঃ দ্বিতীয় খুতবা প্রদান করবে। দুই খুতবা প্রদান করাই সুন্নাত। **(বাইহাকী, ইবনু মাজাহ)**

ঈদের মাঠে মহিলাগণ উপস্থিত থাকলে ইমাম খুতবা প্রদানের পর তাদের নিকট গমন করতঃ তাদেরকেও উপদেশ দিবেন। **(নাসায়ী)**

ঈদ দিবসদ্বয়ে ও তাশরীক দিবস সমূহে রোযা পালন করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। **(বুখারী, মুসলিম)**

মাঠে উপস্থিত মুসল্লীগণ কাতার বা লাইন সোজা করে দাঁড়াবেন। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের ডান ও বামের ব্যক্তিদ্বয়ের পায়ের সাথে পা সংযুক্ত

করে এবং পরস্পর কাঁধের সাথে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়াবেন। ঈদের নামায পড়ছি এরূপ নিয়্যাত করে ইমামের তাকবীরের পরে আল্লাহু আকবার বলে ডান হাত বাম হাতের পিঠের উপর বাঁধবেন। অতঃপর দু'আয়ে ইফতিতাহ (আল্লাহুম্মা বাইদ বাইনী ওয়া বাইনা খাতায়ায়া (অথবা সুবহানাকা আল্লাহুম্মা.........-এর শেষ পর্যন্ত) পড়ে পুনরায় ইমাম তাকবীর বলবেন এবং মুকতাদিগণ তার অনুসরণ করবেন। এরূপ সাত তাকবীর বলার পর ইমাম অন্যান্য নামাযের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে এবং মুকতাদীগণ মনে মনে সূরা ফাতিহা পাঠ করবেন। অতঃপর ইমাম অন্য সূরা পাঠ করবেন এবং মুকতাদীগণ নীরব থেকে তা শ্রবণ করবেন। প্রথম রাকা'আত শেষ হলে দ্বিতীয় রাকা'আতের জন্য দাঁড়াবেন এবং কিরাআতের পূর্বেই প্রথম রাকা'আতের ন্যায় পাঁচ তাকবীর বলবেন ও হস্তদ্বয় উত্তোলন করবেন এবং বাঁধবেন। দুই রাকা'আত শেষ হলে অন্যান্য নামাযের ন্যায় তাশাহ্হুদ ইত্যাদি পড়ে সালাম ফিরাবেন।

(বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ, তিরমিযী, রাওযাতুন নাদিয়া)

ইমাম প্রথম রাকা'আতে সূরা **'ক্বাফ'** কিংবা সূরা **'আ'লা'** পড়বেন এবং দ্বিতীয় রাকা'আতে সূরা **'ক্বামার'** কিংবা সূরা **'গাশিয়া'** পড়বেন।

ঈদের দিন আনন্দ ও উল্লাসের দিবস। যথাসম্ভব দান খয়রাত দ্বারা এবং সৎকার্যে উক্ত দিবস অতিবাহিত করাই বাঞ্ছনীয়। শারীয়াত অনুমোদিত কার্যকলাপ আমোদ-প্রমোদ ছাড়া শারীয়াত বহির্ভূত কাজে লিপ্ত হওয়া কদাচ উচিত নয়।

শাওয়াল মাসের ছয়টি রোযা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি রামাযানের রোযা পালন করার পর শাওয়াল মাসের আরও ছয়টি রোযা পালন করবে আল্লাহ তা'আলা তাকে পূর্ণ বৎসরের সিয়ামের পরিমাণ সাওয়াব প্রদান করবেন। **(তিরমিযী, মুসলিম, আবূ দাউদ)**

আইয়ামে বীয বা সিয়ামুদ্দাহর

প্রত্যেক চান্দ্র মাসের তিন দিন যথা– তের, চৌদ্দ ও পনের তারিখের রোযাকে সিয়ামুদ্দাহর বলা হয়। অর্থাৎ উক্ত দিবসে যে রোযা পালন করবে, সমস্ত বৎসর সিয়াম পালন তুল্য সাওয়াব প্রাপ্ত হয়ে যাবে। উক্ত সিয়ামকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাওমুদ্দাহর পূর্ণ বৎসরের রোযার তুল্য বলেছেন। (বুখারী, মুসলিম)

আরাফা দিবসের রোযা

চান্দ্র বৎসরের শেষ মাস যুলহিজ্জাহ বা হাজ্জের মাস। উক্ত মাসে ফরিযায়ে হাজ্জ সমাধা করণার্থে পৃথিবীর প্রত্যেক স্থান হতে সমৃদ্ধশালী মুসলমানগণ মক্কা নগরে উপস্থিত হন এবং উক্ত মাসের নবম তারিখে হাজ্জের বিশিষ্ট অংশ (وقوف عرفه) সমাধা করার নিমিত্ত মরু প্রান্তরে অবস্থিত আরাফা নামক স্থানে উপস্থিত হয়ে থাকেন। অতএব, উক্ত দিবসকে ইয়াওমুল আরাফা (يوم العرفة) বা আরাফা দিবস বলা হয়। এবং যারা আরাফা প্রান্তে উপস্থিত থাকেন তাদের জন্য সেই দিন সিয়াম পালন করা নিষিদ্ধ। (আবূ দাউদ)

পক্ষান্তরে সেই স্থান ব্যতীত অন্যান্য স্থানে রোযা রাখা সুন্নাত। ইমাম মুসলিম আবূ কাতাদা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে, আরাফা দিবসের রোযা রোযাদারের এক বৎসর পূর্বের এবং এক বৎসর পরের যাবতীয় ক্ষুদ্র পাপরাশি বিমোচিত করে দেয়। (মুসলিম)

উপরন্তু যুলহিজ্জা মাসের প্রথম দশ দিনেরই মর্যাদা হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। নাসাঈ উম্মুল মুমিনীন হাফসা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আশুরার রোযা, যুলহিজ্জার প্রথম নয় দিনের রোযা, প্রত্যেক মাসের তিনটি আইয়ামে বীযের রোযা এবং ফজরের দুই রাকা'আত সুন্নাত; এই আমল চতুষ্টয়কে কখনই পরিত্যাগ করতেন না।

আশুরার রোযা

চান্দ্র বৎসরের প্রথম মাস মুহাররামের দশ তারিখ আশুরা দিবস নামে পরিচিত। উক্ত দিবস রোযা পালন করা মুস্তাহাব। রামাযানের সিয়াম ফরয হওয়ার পূর্বে এই রোযা ফরয ছিল। সিয়ামে রামাযানের ফরযিয়্যাতের পর এর আবশ্যকতা হ্রাস পেয়েছে। কিন্তু ইসতিহাব এখনও বিদ্যমান। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিয়ামে রামাযানের পরেই এর স্থান দিয়েছেন। (মুসলিম)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনা গমনের পর দেখলেন যে, ইয়াহুদীগণ রোযা পালন করছে। কারণ জিজ্ঞাসা করলে তারা বলল যে, এই দিনে আল্লাহ তা'আলা মূসা (আঃ) ও বানী ইসরাঈলগণকে পরাধীনতার অভিশাপ হতে বিমুক্ত এবং ফিরআউনের শাসন ও শোষণ হতে মুক্তি প্রদান করে স্বাধীনতার অমূল্য নিয়ামাত প্রদান করেছিলেন। পক্ষান্তরে, অত্যাচারী ফিরআউনকে সদলবলে নীল সমুদ্রের তরঙ্গাভিঘাতে ধ্বংস করেছিলেন। তাই মূসা (আঃ) আল্লাহর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনার্থে এই রোযা পালন করেছেন এবং আমরা তাঁর অনুসরণে সিয়াম পালন করছি। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন– মূসা (আঃ)-এর সাথে আমার সম্পর্ক ঘনিষ্টতর। অতএব, তিনি উক্ত রোযা পালন করতে নির্দেশ প্রদান করলেন। সন হিজরীর দশম বৎসর সাহাবাগণ (রাঃ) বললেন; হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, ইয়াহুদীগণ ও খৃষ্টানগণ এই দিনের অতিশয় সম্মান করে থাকেন এবং আমাদেরকে তাদের বিরুদ্ধাচরণ করতে আপনি নির্দেশ দিয়েছেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ যদি আমি আগামী বৎসর জীবিত থাকি তবে ন তারিখসহ অর্থাৎ নয় ও দশ তারিখের সিয়াম পালন করব। কিন্তু পর বৎসর মুহাররাম মাস আগমনের পূর্বেই ইহধাম হতে মহাপ্রস্থান করেন। তার আকাঙ্খানুযায়ী সাহাবা ও তাবেয়ীন এবং পরবর্তী সুধীবৃন্দ উক্ত দিবসের সিয়ামকে মুস্তাহাব বলেছেন।

সাওমে দাউদী

একদিন সিয়াম পালন করা এবং অপর দিবস ইফতার করা– এরূপ বৎসর ব্যাপী রোযা রাখাই সাওমে দাউদী অর্থাৎ দাউদ (আঃ) এরূপ রোযা ব্রত পালন করেছিলেন। বর্তমানে যদি কেউ ইচ্ছা করে তবে এরূপ রোযা রাখতে পারবে। (মুসলিম)

শুক্র, শনি, রবি, সোম ও বৃহস্পতিবারের রোযা

শুক্রবার নির্দিষ্টরূপে রোযা রাখা নিষিদ্ধ। অন্য দিবসের সাথে এর রোযা পালন করা যাবে। **(বুখারী, মুসলিম)**

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শনিবার ও রবিবারে সিয়াম পালন করেছেন এবং এটাকে পৌত্তলিকগণের বিরুদ্ধাচরণ বলেই বর্ণনা করেছেন। কারণ পৌত্তলিকগণ উক্ত দিবসদ্বয়ে উৎসবানুষ্ঠান করত। **(আহমাদ)**

সোমবারে রোযা রাখা সম্বন্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞাসা করা হলে বললেন ঃ এই দিন আমি ভূমিষ্ঠ হয়েছি এবং এই দিন আমার প্রতি ওয়াহী অবতীর্ণ হয়েছে অর্থাৎ উক্ত মহাদানদ্বয়ের কৃতজ্ঞতাস্বরূপ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত দিবসে রোযা রেখেছেন। **(মুসলিম)**

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দুই দিবসই রোযা রেখেছেন এবং তিনি বলেছেন, যেহেতু সোমবার ও বৃহস্পতিবারে 'আমল সমূহ আল্লাহর নিকট উপস্থিত করা হয়, সেহেতু উক্ত দিবসদ্বয়ে আমি সিয়াম অবস্থায় থাকা পছন্দ করি, যাতে রোযা অবস্থায় আমার 'আমল পেশ করা হয়। **(তিরমিযী)**

উপসংহার

মা আয়িশা (রাঃ) বলেছেন ঃ কোন সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরূপ নফল রোযা পালন করা আরম্ভ করতেন যে, আমাদের মনে হত– তিনি আর রোযা ত্যাগ করবেন না। আবার কখনও রোযা পরিত্যাগ করতেন, আমাদের ধারণা হত যে, তিনি আর রোযা রাখবেন না। **(বুখারী, মুসলিম)**

ফলকথাঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য একটি রোযা পালন করবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে নরক হতে এত অধিক দূরে রাখবেন যার পরিমাণ দীর্ঘজীবি কাকের জীবনব্যাপী উড়বার দূরত্বের পরিমাণ হবে। অর্থাৎ দীর্ঘজীবি কাক তার জন্ম দিবস হতে উড়তে আরম্ভ করে বৃদ্ধাবস্থায় জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পরিত্যাগের সময় পর্যন্ত যতদূর উড়তে পারবে আল্লাহ তা'আলা সেই রোযাদার ব্যক্তিকে জাহান্নাম হতে ততোধিক দূরে রাখবেন। **(মিশকাত)**

মাওলানা মুন্তাসির আহমাদ রাহমানী প্রণিত অংশ সমাপ্ত

হাফেয মাওলানা হুসাইন বিন সোহ্‌রাব প্রণীত অংশ

রোযা যেভাবে ফরয হলো

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

মু'আয ইবনু জাবাল (রাঃ) বলেন ঃ "নামায ও রোযা তিনটি অবস্থায় পরিবর্তিত হয়।

রোযার তিনটি পরিবর্তন এই ঃ

(১) যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় আগমন করেন তখন তিনি প্রতি মাসে তিনটি রোযা রাখতেন এবং আশূরার রোযা রাখতেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা كتب عليكم الصيام অবতীর্ণ করে রামাযানের রোযা ফরয করেন।

(২) প্রথমত, এই নির্দেশ ছিল যে, যে চাইবে রোযা রাখবে এবং যে চাইবে রোযার পরিবর্তে মিসকীনকে খাদ্য দান করবে। অতঃপর فمن شهد منكم الشهر فليصمه এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। অর্থাৎ, "তোমাদের মধ্যকার যে ব্যক্তি ঐ মাসে (নিজ আবাসে) উপস্থিত থাকে সে যেন তাতে রোযা পালন করে।" সুতরাং যে ব্যক্তি বাড়ীতে অবস্থানকারী হয় এবং মুসাফির না হয়, সুস্থ হয় রুগ্ন না হয়, তার উপর রোযা বাধ্যতামূলক হয়ে যায়। তবে রুগ্ন ও মুসাফিরের জন্য অবকাশ থাকে। আর এমন বৃদ্ধ, যে রোযা রাখার ক্ষমতাই রাখে না সে 'ফিদইয়াহ' দেয়ার অনুমতি লাভ করে।

(৩) পূর্বে রাত্রে নিদ্রা যাওয়ার আগে আগে পানাহার ও স্ত্রী সহবাস বৈধ ছিল বটে; কিন্তু ঘুমিয়ে যাবার পর রাত্রির মধ্যেই জেগে উঠলেও পানাহার ও সহবাস তার জন্যে নিষিদ্ধ ছিল। অতঃপর একদা 'সুরমা' নামক একজন আনসারী (রাঃ) সারাদিন কাজকর্ম করে ক্লান্ত অবস্থায় রাত্রে বাড়ী ফিরে আসেন এবং এ'শার নামায আদায় করেই তাঁর ঘুম চলে আসে। পরদিন কিছু পানাহার ছাড়া তিনি রোযা রাখেন। কিন্তু তাঁর অবস্থা

অত্যন্ত সঙ্গীন হয়ে পড়ে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে জিজ্ঞেস করেন ঃ "ব্যাপার কি?" তখন তিনি সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করেন। এদিকে তাঁর ব্যাপারে তো এই ঘটনা ঘটে আর ওদিকে উমার (রাঃ) ঘুমিয়ে যাওয়ার পর জেগে উঠে স্ত্রী সহবাস করে বসেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আগমন করতঃ অত্যন্ত দুঃখ ও পরিতাপের সাথে এই দোষ স্বীকার করেন। ফলে–

احل لكم ليلة الصيام الرفث الي نساء كم হতে ثم اتموا الصيام الي الليل * (সূরা আল-বাক্বারা ঃ ১৮৭ পর্যন্ত) আয়াত অবতীর্ণ হয় এবং মাগরিব থেকে নিয়ে সুবিহ্ সাদিক পর্যন্ত রামাযানের রাত্রে পানাহার ও স্ত্রী সহবাসের অনুমতি দেয়া হয়। (ইবনু কাসীর)

আয়িশা সিদ্দীকা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, পূর্বে আশূরার রোযা রাখা হতো। যখন রামাযানের রোযা ফরয করে দেয়া হয় তখন আর আশূরার রোযা বাধ্যতামূলক থাকে না; বরং যিনি ইচ্ছা করতেন, রাখতেন এবং যিনি চাইতেন না, রাখতেন না। (বুখারী, মুসলিম)

শারীয়তের পরিভাষায় পানাহার এবং স্ত্রী সহবাস থেকে বিরত থাকার নাম 'সওম'। তবে সুবহে সাদিক উদয় হওয়ার পূর্ব থেকে শুরু করে সূর্যাস্ত পর্যন্ত রোযার নিয়্যাতে একাধারে এ ভাবে বিরত থাকলেই তা রোযা বলে গণ্য হবে। সূর্যাস্তের এক মিনিট আগেও যদি কোন কিছু খেয়ে ফেলে, পান করে, কিংবা সহবাস করে, তবে রোযা হবে না। অনুরূপ উপায়ে সবকিছু থেকে পূর্ণ দিবস বিরত থাকার পরও যদি রোযার নিয়্যাত না থাকে, তবুও রোযা হবে না।

فعدة من ايام اخر অর্থাৎ, রুগ্ন বা মুসাফির ব্যক্তি অসুস্থ অবস্থায় কিংবা সফরে যে কয়টি রোযা রাখতে পারবে না, সেগুলো অন্য সময় হিসাব করে কাযা করা ওয়াজিব। এতে বলা উদ্দেশ্য ছিল যে, রোগজনিত কারণে কিংবা সফরের অসুবিধায় পতিত হয়ে যে ক'টি রোযা ছাড়তে হয়েছে, সে ক'টি রোযা অন্য সময় পূরণ করে নেয়া তাদের উপর ওয়াজিব। এ কথাটি বোঝানোর জন্য فعليه القضاء তার উপর কাযা ওয়াজিব, এতটুকু বলাই

যথেষ্ট ছিল। কিন্তু তা না বলে ايام اخر বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, রুগ্ন এবং মুসাফিরদের অপরিহার্য রোযার মধ্যে শুধু সে পরিমাণ রোযার কাযা করাই ওয়াজিব, রুগী সুস্থ হওয়ার পর এবং মুসাফির বাড়ী ফেরার পর যে কয় দিনের সুযোগ পাবে। কিন্তু সে ব্যক্তি যদি এতটুকু সময় না পায় এবং এর আগেই মৃত্যুবরণ করে তবে তার উপর কাযা কিংবা 'ফিদ্ইয়া'র জন্য ওসীয়ত করা জরুরী নয়।

فعدة من ايا م اخر বাক্যে যেহেতু এমন কোন শর্তের উল্লেখ নেই, যদ্বারা বোঝা যেতে পারে যে, এ রোযা একই সঙ্গে ধারাবাহিকভাবে রাখতে হবে না মাঝে মাঝে বিরতি দিয়ে রাখলেও চলবে।

সুতরাং যার রামাযানের প্রথম দশ দিনের রোযা ফউত হয়েছে সে যদি প্রথমে দশ তারিখের কাযা করে, পরে নয় তারিখের, তারপর আট তারিখের কাযা হিসাবে করতে থাকে, তবে তাতে কোন অসুবিধা হবে না। অনুরূপভাবে দশটি রোযার মধ্যে দু'চারটি করার পর বিরতি দিয়ে দিয়ে অবশিষ্টগুলো কাযা করলেও কোন অসুবিধা হবে না। কেননা, আয়াতের মধ্যে এরূপভাবে কাযা করার ব্যাপারেও কোন নিষেধাজ্ঞা উল্লেখিত হয়নি।

وعلي الذ ين يطيقونه আয়াতের স্বাভাবিক অর্থ দাঁড়ায়, যেসব লোক রোগজনিত কারণে কিংবা সফরের দরুন নয়; বরং রোযা রাখার পূর্ণ সামর্থ, থাকা সত্ত্বেও রোযা রাখতে চায় না, তাদের জন্যও রোযা না রেখে রোযার বদলায় 'ফিদ্ইয়া' দেয়ার সুযোগ রয়েছে। কিন্তু সাথে সাথেই এটুকু বলে দেয়া হয়েছে যে, وان تصوموا خيرلكم অর্থাৎ, রোযা রাখাই হবে তোমাদের জন্য কল্যাণকর।

উপরিউক্ত নির্দেশটি ছিল ইসলামের প্রাথমিক যুগের, যখন লক্ষ্য ছিল ধীরে ধীরে লোকজনকে রোযায় অভ্যস্ত করে তোলা। এরপর অবতীর্ণ আয়াত فمن شهد منكم الشهر فليصمه –এর দ্বারা প্রাথমিক এ নির্দেশ সুস্থ -সবল লোকদের ক্ষেত্রে রহিত করা হয়েছে। তবে যেসব লোক অতিরিক্ত বার্ধক্যজনিত কারণে রোযা রাখতে অপারগ কিংবা দীর্ঘকাল রোগ ভোগের

দরুন দুর্বল হয়ে পড়েছে, অথবা দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হয়ে স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের ব্যাপারে একেবারেই নিরাশ হয়ে পড়েছে, সেসব লোকের বেলায় উপরিউক্ত নির্দেশটি এখনো প্রযোজ্য রয়েছে। সাহাবী ও তাবেয়ীগণের সর্বসম্মত অভিমতও তাই। (মাযহারী)

রামাযান মাসের মাঝে কারো উপর রোযা ফরয হলে

যে লোক পূর্ণ রামাযান মাসকে পাবে, তার উপর গোটা রামাযান মাসের রোযা ফরয হয়ে যাবে। যে লোক এ অবস্থায় কিছু কম সময় পাবে, তার উপর ততদিনই ফরয হবে। কাজেই রামাযান মাসের মাঝে যদি কোন কাফির ব্যক্তি মুসলমান হয়, কিংবা কোন নাবালেগ যদি বালেগ হয়, তবে তার উপর পরবর্তী রোযাগুলোই ফরয হবে; বিগত দিনগুলোর রোযা কাযা করার প্রয়োজন হবে না। অবশ্য পাগল ব্যক্তি মুসলমান ও বালেগ হওয়ার প্রেক্ষিতে যদি ব্যক্তিগত যোগ্যতার অধিকারী হয় আর সে যদি রামাযানের কোন অংশে সুস্থ হয়ে উঠে, তবে এ রামাযানের বিগত দিনগুলোর কাযা করাও তার উপর অবশ্য কর্তব্য হয়ে পড়বে। তেমনিভাবে হায়েয-নেফাসগ্রস্থ স্ত্রীলোক যদি রামাযানের মাঝে পাক হয়ে যায়, তবে বিগত দিনগুলোর রোযা কাযা করা তার পক্ষে জরুরী হবে।

কায়েস বিন সুরমা (রাঃ) সারাদিন জমিতে কাজ করে সন্ধ্যার সময় বাড়ীতে ফিরে আসেন। স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করেন– কিছু খাবার আছে কি? স্ত্রী বলেন– "কিছুই নেই। আমি যাচ্ছি এবং কোথাও হতে নিয়ে আসছি।" তিনি যান, আর এদিকে তাঁকে ঘুমে পেয়ে বসে। স্ত্রী ফিরে এসে তাঁকে ঘুমন্ত অবস্থায় দেখে খুবই দুঃখ প্রকাশ করে বলেন যে, এখন এই রাত্রি এবং পরবর্তী সারাদিন কিভাবে কাটবে? অতঃপর দিনের অর্ধভাগ অতিবাহিত হলে কায়েস (রাঃ) ক্ষুধায় জ্বালায় চেতনা হারিয়ে ফেলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সামনে এর আলোচনা হয়। তখন এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয় এবং মুসলমানেরা সন্তুষ্ট হয়ে যান।

(ইবনু কাসীর)

শয়তান বন্দী ও আল্লাহ্ তা'আলার ডাক

আবূ হুরাইরা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ রামাযান মাসের প্রথম রাত হতেই সমস্ত শয়তানকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হয়। দোযখের দরজাগুলো এমনভাবে বন্ধ করা হয় যে, (রামাযান শেষ না হওয়া পর্যন্ত) সেগুলো আর খোলা হয় না। জান্নাতের দরজাগুলো এমনভাবে খোলা হয় যে, (রামাযান শেষ না হওয়া পর্যন্ত) তা আর বন্ধ করা হয় না। ফেরেশতার দল আহ্বান করতে থাকে, যারা আল্লাহর রহমতের প্রত্যাশী তোমরা দ্রুত আল্লাহর রহমতের দিকে অগ্রসর হও। আর যারা পাপাচারী, তারা একটু দাঁড়াও, ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত হও। মহান আল্লাহ অনেকগুলো মানুষকে রামাযান মাসের প্রতি রাতে দোযখের ভয়াবহ আগুন থেকে মুক্ত করে দেন। **(তিরমিযী)**

আবূ হুরাইরা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ রামাযান মাসের রাত্রি যখন আরম্ভ হয়, তখন আকাশ হতে আহ্বান করতে থাকে হে রহমতে বারীর প্রত্যাশীগণ! তোমরা মহান আল্লাহর রহমত ও মাগফিরাতের দিকে দ্রুতগতিতে অগ্রসর হও। হে পাপাসক্ত পাপীগণ! পাপের কার্য-কলাপ থেকে ক্ষান্ত হও। **(তিরমিযী)**

রামাযানের রোযার গুরুত্ব

ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের একটি স্তম্ভ রামাযানের রোযা। ইচ্ছাকৃত নামায ত্যাগকারী যেমন কাফির হয়ে যায়, তেমনি ইচ্ছাকৃত রোযা বর্জনকারীও কাফিরে পরিণত হয়। উক্ত দু'ই নির্দেশ লংঘনকারীর হুকুম বিনা পার্থক্যে একই। নামায দিন ও রাতের কর্তব্য, যা প্রতিদিনে পাঁচবার এবং রোযা বাৎসরিক কর্তব্য, যা সারা বছরে মাত্র একবার।

আবু উমামাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ একদিন আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, একটি সম্প্রদায়

উল্টো ভাবে ঝুলছে। তাদের গালপাটি ফাড়া। তা থেকে রক্তও ঝরছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এরা কারা? বলা হল– এরা তারা, রাযামান মাসে বিনা ওযরে রোযা রাখে না যারা। (ইবনু খুযাইমা, ইবনু হিব্বান)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ বিনা ওযরে রামাযানের রোযা ত্যাগকারী কাফির এবং তার গর্দান উড়িয়ে দেওয়ার যোগ্য। (আবু ইয়ালা, দায়লামী, ফিকহুস সুন্নাহ)

যে ব্যক্তি শারীয়তী ওযর ছাড়া এই মাসের একটি রোযাও ছেড়ে দেবে সে যদি সারা জীবনও রোযা রাখে তবুও তার গুনাহর ক্ষতিপূরণ হবে না। (বুখারী)

যে ব্যক্তি এই মোবারাক মাসেও আল্লাহকে রাযী করতে পারল না সে বড়ই অভাগা। (ইবনু হিব্বান)

যে ব্যক্তি জেনে শুনে সময়ের আগে রোযা ভেঙ্গে দেবে তাকে জাহান্নামে ঝুলিয়ে রাখা হবে এবং বারবার তার গাল চিরে দেওয়া হবে। ফলে রক্ত ঝরতে থাকবে এবং সে কুকুরের মত চিৎকার দিতে থাকবে। (ইবনু হিব্বান)

রামাযানুল মোবারাকের কারণে জান্নাতকে সারা বছরের জন্য সাজানো হয় এবং রামাযানের প্রথম রাতে আরশ থেকে এক মনোরম বাতাস বইতে থাকে যা জান্নাতের গাছের পাতাগুলো ছুঁয়ে চলে যায়। ফলে এক সুমধুর ও মিষ্টি আওয়াজ সৃষ্টি হয়। তখন বেহেস্তের হুরেরা ফরিয়াদ করে যে, এমন কেউ আছে কি, যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে আমাদের দরখাস্ত পেশ করে? রামাযানের প্রত্যেক রাতে এক আহ্বানকারী এই আহ্বান করে– কোন প্রার্থনাকারী আছে কি, যাকে আল্লাহ দেবেন? কোন তাওবাকারী আছে কি, যার তাওবা তিনি ক্ববূল করবেন? কোন ক্ষমা প্রার্থনাকারী আছে কি, যাকে তিনি ক্ষমা করে দেবেন? এমন কেউ আছে কি যে, সেই আল্লাহ-কে কর্য দেবেন যিনি কাঙ্গাল নন এবং নাদেনেওয়ালাও নন; বরং পুরোপুরি দেনেওলা এবং অশেষ দেনেওলা। (ইবনু হিব্বান)

রামাযান মাসের ফযীলত ও রোযাদারের মর্যাদা

সালমান ফার্সি (রাঃ) বলেন, শাবান মাসের শেষ রাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের সামনে ভাষণ দান করলেন। হে লোকেরা! তোমাদের নিকট একটি মহিমান্বিত অত্যাধিক বরকতময় মাস এসে তোমাদেরকে রহমতের ছায়া দ্বারা আবৃত করে ফেলেছে। এই মাসের এক রাতের ইবাদত এক হাজার মাসের ইবাদত চাইতেও বেশি হবে।

যে মাসের রোযাকে মহান আল্লাহ্ ফরয করে দিয়েছেন এবং রাতের ক্বিয়াম নফল ইবাদতে পরিণত করেছেন। যে ব্যক্তি এই মাসে কোন একটি নফল ইবাদত দ্বারা (আল্লাহর নৈকট্য লাভের চেষ্টা করবে), সে যেন একটি ফরয আদায় করল অতঃপর যে ব্যক্তি একটি ফরয আদায় করল, সে যেন ঐ ফরয ব্যাতিরেকেই ৭০টি ফরয আদায় করল। এই পবিত্র রামাযান মাস অত্যাধিক সবর ও ধৈর্য ধারণের মাস, সবর ও ধৈর্যই মানুষকে জান্নাত পর্যন্ত পৌছে দেবে। পবিত্র রামাযান মাস একে অপরের সাহায্য সহানুভূতির মাস, এই মাস মুমিনদের রুজিতে বরকত নাযিল হওয়ার মাস, যে ব্যক্তি কোন রোযাদারকে. ইফতার করাবে, তার জীবনের সমস্ত গুনাহ্ মাফ হয়ে যাবে এবং তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেয়া হবে। তবে, এতে রোযাদার ব্যক্তির রোযার সওয়াব কোন প্রকার কম করা হবে না। আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞেস করলাম, আমাদের অভাব অনটন ও দারিদ্রতার প্রকোপে আমাদের বাড়ীতে এমন কোন বস্তু নাই যা দিয়ে কোন রোযাদারকে আমরা ইফতার করাব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ যে ব্যক্তি শুধুমাত্র এক ছটাক দুধ অথবা একটা খেজুর অথবা অল্প কিছু পানির শরবত দিয়ে কোন রোযাদারকে ইফতার করাবে, আল্লাহ তাকে কিয়ামতের দিন হাওজে কাওসার হতে এমন এক শরবত পান করাবেন যে, সে বেহেশতে প্রবেশ না করা পর্যন্ত পিপাসিত হবে না। এই মাহে মুবারাক (বিশ্ব নিয়ন্তার এমন এক অবদান) যার প্রথম ভাগে অবতীর্ণ হয় আল্লাহর অসংখ্য রহমত। দ্বিতীয় ভাগে নেমে

আসে অসংখ্য মাগফিরাত ও ক্ষমা। তৃতীয় ভাগে স্বয়ং আল্লাহ মানুষকে মুক্তি দিয়ে থাকেন। যে ব্যক্তি রামাযান মাসের মান-মর্যাদা রক্ষার্থে দাস-দাসী, চাকর-চাকরাণীর কাজ-কর্ম হালকা করে দেয়, আল্লাহ্ তার গুনাহ্ মাফ করে দেন এবং তাকে দোযখের আগুনের ভয়াবহ আজাব হতে মুক্তি দান করেন। (বাইহাকী)

আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেন– রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের নিকট অতি মুবারাক মাস রামাযান আগমন করেছে যার রোযাগুলো তোমাদের উপর আল্লাহ্ ফরয করে দিয়েছেন, পবিত্র রামাযান মাসের মর্যাদা রক্ষার জন্য আকাশ সমূহের সমস্ত দরজা খুলে দেয়া হয়েছে। এই মাসের মর্যাদা রক্ষার্থে দোযখের সমস্ত দরজাগুলো বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। আর দুষ্ট প্রকৃতির শয়তানগুলোকে লৌহ শিকল দিয়ে কঠিন ভাবে আবদ্ধ করে দেয়া হয়েছে। আল্লাহর ইবাদাতের জন্য একটি বিশেষ রাত নির্ধারিত আছে, যার ইবাদাত-বন্দেগী এক হাজার মাসের ইবাদাত-বন্দেগী হতেও অনেক বেশি। যে হতভাগ্য ব্যক্তি সে রাতের ইবাদাত-বন্দেগী হতে বঞ্চিত, সে হতভাগ্য আল্লাহর করুণা হতে মাহরুম। (আহমাদ)

সাহল ইবনু সায়াদ (রাঃ) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ জান্নাতের মধ্যে আটটি দরজা আছে। এই দরজাগুলির মধ্যে একটি দরজার নাম রাইয়ান (পিপাসিত ব্যক্তিদের তৃপ্তিদানকারী)। ঐ রাইয়ান নামক দরজা দিয়ে একমাত্র রোযাদার ব্যক্তিগণ ব্যতীত আর কেউ প্রবেশ করতে পারবে না। (বুখারী, মুসলিম)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ বান্দারা যদি রামাযানের মাহাত্ম্য জানতো তাহলে তারা সারা বছরটাই রামাযান হবার আকাঙ্খা করতো। (ইবনু খুযাইমা)

আর এক বর্ণনায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বদদু'আ দিয়ে বলেন ঃ সেই ব্যক্তির নাক মাটিতে মিশে যাক (ধ্বংস হোক), যে রামাযান পেল অথচ নিজেকে ক্ষমাপ্রাপ্ত করে নিতে পারল না।

(তিরমিযী, মিশকাত)

রামাযান মাসের বহুমুখী মাহাত্ম্যের কারণে রামাযানের দু'মাস আগে যখন রজবের চাঁদ উঠতো তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবেগভরে এই দু'আ করতেন ঃ

اللهم بارك لنا فى رجب وشعبان وبلغنا رمضان *

উচ্চারণ ঃ আল্লা-হুম্মা বা-রিক লানা ফী রাজাবা ওয়া শা'বা-না অবাল্লিগ্না রামাযান।

অর্থাৎ– হে আল্লাহ! রজব ও শাবানে আমাদের জন্য বরকত দিও এবং রামাযানে আমাদেরকে পৌঁছে দিও। **(বাইহাকী, মিশকাত)**

ওমরা করা ও মক্কায় রোযা রাখার ফযীলত

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি এই মাস মক্কায় কাটাবে ও স্বীয় রোযার খুব ভাল করে হিফাযত করবে এবং সাধ্যমত ইবাদত করবে সে অন্য জায়গায় এক লাখ রামাযান পালনের নেকী পাবে এবং প্রত্যেক দিনের বদলে একটি গোলাম ও প্রত্যেক রাতের বদলে একটি করে গোলাম (ক্রীতদাস) আযাদের সাওয়াব পাবে। আর প্রত্যেক দিন আল্লাহ্ তা'আলার পথে একটি সাওয়ারী দান করার ও প্রত্যেক দিন রাতের বিনিময়ে নেকী পাবে। **(ইবনু মাজাহ)**

রামাযান মাসে ওমরা করার সওয়াব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে হজ্জ করার সমান। **(মুসলিম)**

রোযাদারকে ইফতার করানোর ফযীলত

জায়িদ ইবনু খালিদ (রাঃ) বলেন– রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি কোন রোযাদারকে ইফতার করাবে অথবা জিহাদের আসবাবপত্র সংগ্রহ করে দেবে, সে ব্যক্তি মুজাহিদের জিহাদের সমান ও রোযাদার ব্যক্তির রোযা রাখবার সমান সওয়াব পাবে। **(বাইহাকী)**

জায়িদ ইবনু খালিদ (রাঃ) আরো বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– যে ব্যক্তি কোন রোযাদারকে ইফতার করাবে সে রোযাদার ব্যক্তির রোযা রাখার সমান সওয়াব পাবে। তবে রোযাদার ব্যক্তির রোযার সওয়াব হতে বিন্দুমাত্র কমানো হবে না।

(তিরমিযী)

সালমান ফার্সী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুৎবা প্রদান কালে বলেন ঃ যে ব্যক্তি কোন রোযাদারকে পেট পূর্ণ করে খানা খাওয়াবে, আল্লাহ তাকে হাউযে কাওসার থেকে এমন এক শরবত পান করাবেন যে, সে পিপাসিত হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত সে জান্নাতে প্রবেশ না করবে। (বাইহাকী)

রোযার নিয়্যাত

হাফসাহ (রাঃ) বলেন– রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ফজরের পূর্বে যে রোযার নিয়্যাত করল না, তার রোযা হবে না।

(তিরমিযী)

এই হাদীসের মর্মে ইমাম তিরমিযী বলেন ঃ রামাযানের অথবা মানতের রোযা, বকেয়া কাযা পূরণ করার সময়, নজরের রোযা অথবা মানতের রোযা বা যে কোন রোযা নতুন ভাবে করতে হলে তার নিয়্যাত ফজরের পূর্বে হতে হবে। অতঃপর তিনি বলেন ঃ নফল রোযার নিয়্যাত ফজরের পরে করলেও চলবে। (তিরমিযী)

রোযাদার বা নামাযী যে রোযার বা নামাযের জন্য দাঁড়াবে, মনে মনে তার সংকল্প করা আবশ্যক। যেমন ফরজ ২৯/৩০টি রোযার জন্য প্রতিদিন প্রতি ১টা রোযার জন্য পৃথক পৃথক নিয়্যাত অথবা যেমন ঃ যোহর নামায আসর নামায। অনুরূপভাবে উক্ত দু'ওয়াক্তের সুন্নাত নামায সমূহ। আর সেটা হচ্ছে শর্ত অথবা রুকন। নিয়্যাত মুখে উচ্চারণ করে পড়া সুন্নাতের পরিপন্থী অর্থাৎ বিদআত।

ইমাম চতুষ্টয়ের কোন অন্ধ অনুসারীও এরূপ বলেননি।

সাহারীর সঠিক সময়

রাতের অন্ধকারকে কালো রেখা এবং ভোরের আলো ফোটাকে সাদা রেখার সাথে তুলনা করে রোযা শুরু এবং খানা-পিনা হারাম হওয়ার সঠিক সময়টি বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে। অধিকন্তু এ সময়সীমার মধ্যে বেশ-কম হওয়ার সম্ভাবনা যাতে না থাকে সেজন্য কুরআন মজীদে حتى يتبين لكم الخيط। শব্দটিও যোগ করে দেয়া হয়েছে। এতে সুস্পষ্টভাবে বলে দেয়া হয়েছে যে, সন্দেহপ্রবণ লোকদের ন্যায় সুব্হে-সাদিক দেখা দেয়ার আগেই খানা-পিনা হারাম মনে করো না অথবা এমন অসাবধানতাও অবলম্বন করো না যে, সুবহে-সাদিকের আলো ফুটে উঠার পরও খানা-পিনা করতে থাকবে। বরং খানা-পিনা এবং রোযার মধ্যে সুব্হে-সাদিকের উদয় সঠিকভাবে নির্ণয়ই হচ্ছে সীমারেখা। এ সীমারেখা উদয় হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত খানা-পিনা বন্ধ করা জরুরী মনে করা যেমন জায়িয নয়, তেমনি সুবহে-সাদিক উদয় হওয়ার ব্যাপারে বিশ্বাস হয়ে যাওয়ার পর খানা-পিনা করাও হারাম এবং রোযা নষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণ, তা এক মিনিটের জন্য হলেও। সুব্হে সাদিক উদয় সম্পর্কে বিশ্বাস হওয়া পর্যন্তই সাহরীর শেষ সময়।

উপরিউক্ত আলোচনাগুলো শুধুমাত্র সেসব লোকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যাদের নিজের চোখে 'সুবেহ-সাদিক' দেখে সময় নির্ধারণ করার সুযোগ রয়েছে। যেমন, আকাশ যদি পরিষ্কার থাকে এবং সময় সম্পর্কেও যদি তাদের সঠিক জ্ঞান থাকে। কিন্তু যাদের তেমন সুযোগ নেই, অর্থাৎ, আকাশ ঠিকমত দেখার সুযোগ নেই, সুব্হে-সাদিকের উদয় সম্পর্কে সঠিক ধারণাও নেই, কিংবা আকাশ যদি মেঘাচ্ছন্ন থাকে, তবে এক্ষেত্রে সেসব লোকের পক্ষে অন্যান্য লক্ষণের সাহায্য নিয়ে সাহ্রী-ইফতারের সময় নির্ধারণ করতে হবে। অবশ্য এসব হিসাবের মধ্যেও এমন সময় আসতে পারে, যে সময়সীমার মধ্যে সুবহে-সাদিকের উদয় হওয়ার ব্যাপারে বিশ্বাস বা স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছা যায় না। এমতাবস্থায় সন্দেহযুক্ত সময়ে কি করা উচিত, এ সম্পর্কে ইমাম জাস্সাস 'আহকামুল-কুরআন' গ্রন্থে বলেন– এরূপ ক্ষেত্রে নীতিগতভাবে খানা-পিনা না করাই কর্তব্য। তবে এরূপ সন্দেহপূর্ণ সময়ের মধ্যে অর্থাৎ, সুবহে-সাদিক উদয় হওয়ার পূর্বক্ষণে যদি

কেউ প্রয়োজনবশতঃ খানা-পিনা করে ফেলে, তবে সে গোনাহ্গার হবে না। কিন্তু পরে তাহ্কীক বা যাচাই করে যদি দেখা যায়, যে সময় সে খানা-পিনা করেছে সে সময় সুব্হে-সাদিক হয়ে গিয়েছিল, তবে তার পক্ষে সেদিনের রোযার কাযা করা ওয়াজিব। যেমন, রামাযানের এক তারিখে চাঁদ না দেখার কারণে লোকেরা রোযা রাখল না, কিন্তু পরে জানা গেল যে, ২৯শে শাবানেই রামাযানের চাঁদ উদিত হয়েছিল। তবে এমতাবস্থায় যারা সে দিনটিকে ৩০শে শাবান মনে করে রোযা রাখেনি তারা গোনাহগার হবে না, তবে তাদের এ দিনের রোযা সকল ইমামের মতেই কাযা করতে হবে। অনুরূপভাবে মেঘলা দিনে কেউ সূর্য অস্ত গেছে মনে করে ইফতার করে ফেললো, কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই সূর্য দেখা দিল এমতাবস্থায় এ ব্যক্তি গোনাহ্গার হবে না সত্য, তবে তার উপর ঐ রোযা কাযা করা ওয়াজিব হবে।

ইমাম জাস্সাসের উপরিউক্ত বর্ণনায় বোঝা যায় যে, কোন ব্যক্তি যদি ঘুম ভাঙ্গার পর শুনতে পায় যে, ফজরের আযান হচ্ছে, তখন তার নিকট সুব্হে-সাদিক উদয় হওয়া সম্পর্কে নিঃসন্দেহে বিশ্বাস হয়ে যায়। এরপর যদি সে জেনে শুনে কিছু খেয়ে নেয়, তবে সে গোনাহ্গারও হবে এবং তার উপরে সে রোযা কাযা করাও ওয়াজিব হবে।

সাহারী বিলম্বে খাওয়া উচিত, যেন সাহারী খাওয়ার কিছুক্ষণ পরেই সুবহে-সাদিক হয়ে যায়। আনাস (রাঃ) বলেন ঃ "আমরা সাহারী খাওয়া মাত্রই নামাযে দাঁড়িয়ে যেতাম। আযান ও সাহারীর মধ্যে শুধু মাত্র এটুকুই ব্যবধান থাকতো যে, পঞ্চাশটি আয়াত পড়ে নেয়া যায়।" (বুখারী, মুসলিম)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ "যে পর্যন্ত আমার উম্মাত ইফতারে তাড়াতাড়ি এবং সাহারীতে বিলম্ব করবে সে পর্যন্ত তারা মঙ্গলে থাকবে।" (মুসনাদ আহমাদ)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "বিলালের (রাঃ) আযান শুনে তোমরা সাহারী খাওয়া হতে বিরত হবে না। কেননা তিনি রাত্রি থাকতেই আযান দিয়ে থাকেন। তোমরা খেতে ও পান করতে

থাক যে পর্যন্ত না হযরত আবদুল্লাহ ইবনু উম্মি মাকতূম আযান দেন। ফজর প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত তিনি আযান দেন না।" (বুখারী, মুসলিম)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ওটা ফজর নয় যা আকাশের দিগন্তে লম্বাভাবে ছড়িয়ে পড়ে। ফজর হলো লাল রং বিশিষ্ট এবং দিগন্তে প্রকাশমান। (আহমাদ)

একটি বর্ণনায় যে প্রথম আযানের মুয়ায্যিন ছিলেন বিলাল (রাঃ), তার কারণ বলেছেন এই যে, ঐ আযান ঘুমন্ত ব্যক্তিদেরকে জাগাবার জন্য এবং (তাহাজ্জুদের নামাযে) দণ্ডায়মান ব্যক্তিদেরকে ফিরাবার জন্য দেয়া হয়। ফজর এরূপভাবে হয় না যতক্ষণ না এরূপ হয় (অর্থাৎ আকাশের উর্ধ্বে দিকে উঠে যায় না, বরং দিগন্ত রেখার মত প্রকাশমান হয়)।

আনাস (রাঃ) বলেন– আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ইয়াহুদ-নাসারাদের রোযার মধ্যে আর আমাদের রোযার মধ্যে পার্থক্য এই যে, আমরা ফজরের পূর্বে সাহারী খেয়ে রোযা রাখি আর ইয়াহুদ-নাসারাগণ সাহারী খায় না। (মুসলিম)

সহীহ্ হাদীস থেকে আরও প্রমাণিত হয় ঃ

عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : تسحروا فان في السحور بركة *

আনাস (রাঃ) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– তোমরা রোযা রাখার জন্য সাহারী খাও। কারণ এর মধ্যে কল্যাণ নিহিত। (বুখারী, মুসলিম)

সাহারী মানে ফজরের পূর্বের খাওয়া। কারণ শরীর ও মন-মানসিকতা সুস্থ ও সবল রাখার জন্য এটা আল্লাহর অবদান।

অপর এক হাদীসে এরবায বিন সাবিয়া (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ

دعانى رسول الله صلى الله عليه وسلم الى السحور فى رمضان فقال هلم الى الغداء المبارك *

একদা মাহে রামাযানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে সাহারী খাওযার দাওয়াত দিলেন এবং তিনি এই বলে ডাকলেন, তুমি বরকতপূর্ণ আহারের জন্য এসো। (আবূ দাউদ, নাসায়ী)

ইফতার কখন করতে হবে

আবূ হুরাইরা (রাঃ) বলেন– রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, চির দিন ইসলাম ধর্ম সমগ্র বিশ্বে জয়ী ও প্রভাবশালী হয়ে থাকবে যতদিন পর্যন্ত মুসলমানেরা সূর্য অস্তমিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিন্দুমাত্র কাল বিলম্ব না করেই ইফতার করবে। ইয়াহুদ-নাসারা চির দিন বিলম্বে ইফতার করে। (আবূ দাউদ)

হাদীসের মর্মার্থ এই যে, ইফতার বিলম্বে করলে আল্লাহ রাগান্বিত হন। দ্রুত ইফতার করলে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ আর আল্লাহ রাজি থাকলে দ্বীন ইসলামের চির উন্নতি ও বিজয় লাভ হবে।

সূর্য অস্তমিত হওয়ার পর বিলম্বে ইফতার করলে আল্লাহর হুকুম লঙ্ঘন করা হয়।

সূর্য ডোবার পরপর যত তাড়াতাড়ি ইফতার করা হবে তত কল্যাণ।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

عن سهل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لايزال الناس بخير ماعجلو الفطر *

মানুষ সর্বক্ষণ কল্যাণের সাথে থাকবে যতকাল তারা তাড়াতাড়ি ইফতার করবে। (বুখারী, মুসলিম)

হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ ফরমান ঃ

احب عبادى الى اعجلهم فطرا *

আমার বান্দাদের মধ্যে আমার কাছে অধিক প্রিয় তারাই যারা তাড়াতাড়ি ইফতার করে। (তিরমিযী)

খেজুর দ্বারা ইফতার করা সুন্নাত

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

اذا افطر احد كم فليفطر على تمر فانه بركة فان لم يجد فليفطر على ماء فانه طهور *

যখন তোমাদের কেউ ইফতার করে তখন সে যেন খেজুর দ্বারা ইফতার করে, কেননা তাতে বরকত রয়েছে। যদি খেজুর না পায় তবে যেন পানি দ্বারা ইফতার করে, কারণ উহা পবিত্রকারী। (মিশকাত)

বিভিন্ন প্রকার খাদ্য দ্রব্যের মধ্যে ইফতারীতে খেজুরে বরকত ও পানিতে পবিত্রতা অর্জিত হওয়ার তাৎপর্যও কোথায়? সম্ভবত সারাদিনের ক্ষুধাতুর খালি পেটে সর্বপ্রথম খেজুর খাওয়া হলে তা স্বাস্থ্য ও পরিপাক কার্যের জন্য বিশেষ উপকারী। খালি পেটে সামান্য খেজুর ভিটামিনযুক্ত ওষুধের কাজ দেবে। খেজুরের অভাবে স্বচ্ছ পানি দ্বারা ইফতার করা হলে খালি পেটে সর্বপ্রথম টক, ঝাল, গরম ইত্যাদির জায়গায় স্বচ্ছ পবিত্র পানিই প্রবেশ করে, যা মানুষের মনে ও শরীরে পবিত্রতা আনে। পরিপাক যন্ত্র ও রক্ত চলাচল সচল-সক্রিয় রাখে।

সাল্‌মান ইবনু আমির (রাঃ) বলেন– রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যখন তোমাদের মধ্যে কেউ ইফতার করবে তখন তোমরা খেজুর দ্বারা ইফতার করবে। যদি এই বরকতময় বস্তু না পাওয়া যায় তবে পানি পান করেই ইফতার করবে। নিশ্চয় পানি পবিত্র। (তিরমিযী)

কারণ এই খেজুর শক্তি বৃদ্ধি, মন-মানসিকতা, স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য সহায়ক এবং রুচি বৃদ্ধি ও পীড়া নিবারক। এই জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খেজুর দ্বারা ইফতার করাকে এক কথায় বরকত বলেছেন।

আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের (মাগরিবের) পূর্বে ইফতার করতে বসে তাজা খেজুর দ্বারা

ইফতার করতেন। (যদি তিনি তাজা খেজুর না পেতেন) তাহলে তিনি শুকনা খুরমা দ্বারা ইফতার করতেন। (ইফতার করার সময়) শুকনা খুরমা না পেলে তিনি কয়েক অঞ্জলি পানি দ্বারা ইফতার করতেন। (তিরমিযী)

এই হাদীস দুটি প্রমাণ করে যে, খেজুর দিয়ে ইফতার করা উচিত। যদি কারো ভাগ্যে খেজুর না জোটে তাহলে তিনি পানি দিয়ে ইফতার করবেন। পৃথিবীতে এমন কোন লোক নেই যার ভাগ্যে খেজুর না জুটলেও পানিও জোটে না। অতএব আমার যেসব ভাইয়েরা কাঁচা ছোলা, কিংবা ডাল, অথবা আদা, নতুবা আলো চাল, অথবা ক্ষীর কিংবা কোন প্রকার মিষ্টি জাতীয় জিনিষ দিয়ে ইফতার করেন তারা শুধু ইফতারই করেন রাসূলের সুন্নাতের ধার ধারেন না। যারা বিভিন্ন প্রকার ফলমূল দিয়ে ইফতার করেন তারা খেজুর দিয়ে ইফতার শুরু করেন। যদি কেউ সুন্নাতে নববীর আদর্শে আদর্শবান হতে চান তাহলে তাকে খেজুর দিয়ে ইফতার শুরু করতে হবে। তারপর যা ইচ্ছা সে খেতে পারবে।

নতুন চাঁদ দেখার দু'টি দু'আ

* هلال خير ورشد هلال خير ورشد امنت بالذى خلقك

উচ্চারণ ঃ হিলালু খাইরিউঁ ওয়ারুশদিন হিলালু খাইরিউঁ ওয়ারুশদিন আমানতু বিল্লাযী খালাক্বাকা।

অর্থ ঃ মঙ্গল ও পথ দেখানোর চাঁদ, মঙ্গল ও পথ দেখানোর চাঁদ, তোমাকে যিনি সৃষ্টি করেছেন আমি তাঁর প্রতি ঈমান এনেছি। (মিশকাত)

* اللهم اهله علينا بالامن والايمان والسلامة والاسلام ربى وربك الله

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা আহিল্লাহু 'আলাইনা বিল আমনি ওয়াল ঈমানি ওয়াস সালামাতি ওয়াল ইসলামি রাব্বী ওয়া রাব্বুকাল্লাহ।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! তুমি (চাঁদকে) উদয় কর আমাদের প্রতি নিরাপত্তা, ঈমান, শান্তি ও ইসলামের সাথে। হে চাঁদ! আমার প্রভু ও তোমার প্রভু এক আল্লাহ। (তিরমিযী)

ইফতারের সময় দু'আ কবূল হয়

রামাযান মাসের প্রত্যেক দিনে এমন দশ লাখ লোককে আল্লাহ তা'আলা জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেন যাদের জাহান্নাম যাওয়া অবধারিত ছিল। (তারগীব)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ রামাযানের সময় আল্লাহ তা'আলা জাহান্নামীদের মুক্তি দেন। (ইবনু মাজাহ, আবদুর রাযযাক)

অন্য হাদীসে বলা হয়েছে যে, বিশেষ করে ইফতারের সময় তা রদ হয় না। যেমন তিনি বলেন ঃ ইফতারের সময়ে দু'আ খুব তাড়াতাড়ি কবূল হয় এবং ঐ সময়ে আল্লাহ তা'আলা প্রতিদিন ৬০ হাযার লোককে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেন। (বায়হাকী)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন ঃ ইফতারের সময় রোযাদারের দু'আ নিশ্চয় রদ হয় না। (ইবনু মাজাহ)

উপরিউক্ত হাদীসগুলো আমাদের শিক্ষা দেয়, ইফতারের সামগ্রী সাজাতে অথবা আজেবাজে গল্পগুজবে সময় নষ্ট না করে ইফতারের ১০/১৫ মিনিট আগে ইফতারের খাদ্যদ্রব্য নিয়ে বসা এবং বসে বসে দু'আয় রত হওয়া।

যেহেতু আল্লাহ প্রতিদিন লাখ লাখ জাহান্নামীকে মুক্তি দেন সেহেতু আমাদের অনেকে হয়ত তার দু'আর কারণে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেয়ে যেতে পারেন। আল্লাহ আমাদেরকে ইফতারের মূল্যবান সময়ের মূল্যায়ন করার তাওফীক দান করেন –আমীন।

ইফতারের দু'আ

اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت *

আল্লাহুম্মা লাকা সুমতু ওয়া'আলা রিযক্বিকা আফ্তারতু।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! তোমার জন্য রোযা রাখলাম আর তোমারই প্রদত্ত আহার দিয়ে ইফতার করছি। (আবূ দাঊদ)

ইফতারের শেষে দু'আ

ذهب الظماء وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله *

উচ্চারণ ঃ যাহাবায্‌যামায়ু ওয়াবতাল্লাতিল 'উরূকু ওয়াসাবাতাল্ আজরু ইনশা-আল্লাহ্।

অর্থ ঃ পিপাসা মিটেছে, শরীরের শিরা উপশিরা সিক্ত হয়েছে এবং বিশ্ব নিয়ন্তার নিকট আমাদের সওয়াব নির্ধারিত হয়েছে। **(বুখারী)**

হাদীসের অর্থের দিকে লক্ষ্য করলে বোঝা যায় যে, প্রথম দু'আটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইফতার শুরু করার সময় পড়তেন এবং শেষ দু'আটি ইফতার শেষ করারপর পড়তেন।

শবে ক্বাদারের রাত্রিতে বিশেষ দু'আ

اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا *

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নাকা 'আফুউ্উন তুহিব্বুল্ আফওয়া ফা'ফু 'আন্না।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! অবশ্যই তুমি ক্ষমাশীল, তুমি ক্ষমা করাকে ভালবাস, অতএব তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও। **(তিরমিযী, ইবনু মাজাহ)**

তৌবা ও ইসতিগফারের দু'টি দু'আ

رب اغفرلى وتب على انك انت التواب الغفور *

উচ্চারণ ঃ রাব্বিগফিরলী ওয়াতুব 'আলাইয়া ইন্নাকা আনতাত্ তাও্ওয়াবুল গাফুর।

অর্থ ঃ হে আমার প্রভু! তুমি আমার গুনাহ্ ক্ষমা কর আর আমার তৌবা ক্ববূল কর। নিশ্চয় তুমি তৌবা ক্ববূলকারী, গুনাহ্ মার্জনাকারী।

(তিরমিযী, আবূ দাঊদ, ইবনু মাজাহ)

ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفرلنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين *

উচ্চারণ ঃ রাব্বানা যালামনা আনফুসানা ওয়া ইল্লাম তাগফির্লানা ওয়া তার্হামনা লানাকূনান্না মিনাল্ খাসিরীন।

অর্থ ঃ হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আমাদের নাফ্সের (নিজের) উপর যুলুম করেছি, যদি তুমি আমাদের ক্ষমা ও দয়া না কর, তাহলে আমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে গণ্য হবো। (সূরা আল-'আরাফ ৩২ আয়াত)

রামাযান মাসে স্ত্রী সহবাস

অনেকের ধারণা রামাযান মাসের দিনে ও রাতে স্বামী-স্ত্রী সহবাস একেবারেই নিষিদ্ধ। এটা একটা ভুল ধারণা। রামাযান মাসে ইফতারের পর 'সুবহে সাদিক' অর্থাৎ সাহারী খাওয়ার শেষ সময় পর্যন্ত সহবাস করা বৈধ।

সুবহে সাদিকের পর থেকে ইফতার করার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত অর্থাৎ রোযা থাকা অবস্থায় অবৈধভাবে হস্তমৈথুন অথবা অন্য কিছুতে ঘর্ষণ ইত্যাদি পথে বীর্যপাত করলে রোযা নষ্ট হয়ে থাকে। যদি কেউ জোরপূর্বক সহবাস করতে বাধ্য করায় তাতেও রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে এবং পরে তাকে উক্ত রোযা কাযা হিসেবে করতে হবে। এর জন্য তার কোনরূপ কাফফারা দিতে হবে না।

রামাযান মাসে দিনের বেলায় স্বপ্নদোষ হলে তাতে রোযা ভঙ্গ হবে না এবং কোনরূপ কাফফারাও দিতে হবে না।

পবিত্র রামাযান মাসে রোযা অবস্থায় কিংবা অন্য যে কোন মাসে নফল রোযা বা কাযা রোযা রাখা অবস্থায় দিনের বেলা সহবাস করা হারাম। অবশ্য ইফতারের পর সহবাস করতে নিষেধ নাই। তবে শারীরিক ক্লান্তির জন্য শেষ রাতে সাহারীর পূর্বেও সহবাস করে নিতে পারে। এমতাবস্থায় সাহারী খাওয়ার সময় কম থাকলে সাহারী খেয়ে গোসল করলেও চলবে। তবে খাওয়ার পূর্বে ওযূ করে নিতে হবে। যদি কেউ সাহারীর পরে সুবহে সাদিক অর্থাৎ সাহারী খাওয়ার শেষ সময়ও সহবাস

করে তবুও সে রোযা রাখতে পারবে। তবে বিশেষভাবে সতর্ক থাকতে হবে যে, সহবাস করতে থাকা অবস্থায় যাতে সুবহে সাদিক না হয়ে যায়। অবশ্য ঐ সময় যৌন মিলনের লিপ্ত না হওয়াই ভাল। উত্তম হবে তারাবীহ নামাযের পর সাহারীর পূর্বে যে কোন সুবিধামত সময়ে সহবাস করা।

রোযা রাখা অবস্থায় স্ত্রী সঙ্গমে লিপ্ত হলে যে জরিমানা দিতে হয় তা নিম্ন হাদীস থেকে প্রমাণিত হয়েছে ঃ

عن ابی هريرة (رض:) قال اتاه رجل فقال يا رسول الله هلكت قال وماهلكك ـ قال وقعت على إمرأتى في رمضان قال هل تستطيع ان تعتق رقبة ـ قال لا قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين قال لا ـ قال فهل تستطيع ان تطعم ستين مسكينا ـ قال لا قال اجلس فاتى النبي (ص:) بعرق فيه تمر والعرق المكتل الضخم قال فتصدق به ـ فقال ما بين لابتيها احد افقرمنا ـ قال فضحك النبى (ص:) حتى بدت انيابه ـ قال خذه فاطعمه اهلك *

আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলল- হে আল্লাহর রাসূল! আমি ধ্বংস হয়ে গেছি। তিনি বললেন- তোমাকে কিসে ধ্বংস করল? সে বলল, আমি রামাযানে (রোযা অবস্থায়) আমার স্ত্রীর উপর নিপতিত হয়েছি অর্থাৎ সহবাস করে ফেলেছি। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তুমি কি একটি ক্রীতদাস মুক্ত করার সামর্থ্য রাখ? সে বলল ঃ না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তাহলে তুমি কি ক্রমাগত দু'ইমাস রোযা রাখতে পারবে? সে বলল- না। তিনি আবার জিজ্ঞাসা করলেন ঃ ষাট জন মিসকীন খাওয়ানোর সাধ্যকি তোমার আছে? সে বলল- না। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন- বস। এই সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম-এর নিকট একটি পাত্র আনাহলো। পাত্রটি ছিল ওজনের। তাতে খেজুর ভর্তি ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন– এই পাত্রের খেজুরগুলি তুমি দান করে দাও। তখন লোকটি বলল– মদীনায় আমাদের অপেক্ষা অধিক গরীব আর কেউ নেই। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেসে দিলেন। এতে তাঁর দন্তরাজি প্রকাশিত হলো। তিনি বললেন ঃ তুমি এটা নিয়ে যাও এবং তোমার ঘরের লোকদের খাওয়াও। (তিরমিযী)

উক্ত হাদীস থেকে স্পষ্ট বুঝা যায়, লোকটি ইচ্ছা পূর্বক ও সচেতন ভাবেই স্ত্রী সহবাসে প্রবৃত্ত হয়েছিল এবং সে জেনে বুঝে এ কাজ করেছিল। কেননা সে যে পাপ করেছে তার পরিণতি ধ্বংস হওয়া ছাড়া আর কিছু না। তাই লোকটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলছিল– "ধ্বংস হয়ে গেছি!" একজন ঈমানদার ব্যক্তিরই এ ধরনের বিপদের মধ্যে নিপতিত হলে এবং এমন কাজ করলে চরম লজ্জা ও অনুতাপ এবং অন্তরে তীব্র ক্ষোভ ও বেদনা প্রকাশ পায়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকটিকে কাফ্‌ফারা আদায়ের পরামর্শ দিলেন। এর অর্থ, রোযাদার দিনের বেলা স্ত্রী সহবাস করলে তাকে কাফ্‌ফারা আদায় করতে হবে। পরপর তিন ধরনের কাফ্‌ফারার প্রস্তাব করা হয়। ক্রীতদাস মুক্ত বা ক্রমাগত দুইমাস রোযা করা কিংবা ষাটজন মিসকীন খাওয়ানোর প্রস্তাব দিলেন। কিন্তু এর প্রত্যেকটি প্রস্তাবেই সে নিজের অক্ষমতার কথা বলে। এটা হতে বুঝা যায়, এ ধরনের অপরাধের এটাই কাফ্‌ফারা। যেটা তার পক্ষে সম্ভব সে সেটাই করবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم *

রোযার রাত্রিতে স্ত্রী সহবাস তোমাদের জন্য জায়িয করা হয়েছে।
(সূরা আল-বাক্বারা ১৮৭ আয়াত)

তাফসীর ইবনু কাসীরে উক্ত আয়াতের তাফসীরে বলা হয়েছে যে, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক এত গাঢ় যার জন্য রোযার রাত্রেও তাদেরকে মিলনের

অনুমতি দেয়া হচ্ছে। উপরিউক্ত আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণ হচ্ছে যে, ইফতারের পূর্বে বা পরে কেউ ঘুমিয়ে পড়ার পর রাত্রির মধ্যেই জেগে উঠলেও সে পানাহার এবং স্ত্রী সহবাস করতে পারত না। কারণ, তখন এই নির্দেশ ছিল। অতঃপর মহান আল্লাহ উক্ত আয়াত অবতীর্ণ করে এই নির্দেশ উঠিয়ে নেন। এখন রোযাদার ব্যক্তি মাগরিব থেকে সুবহে সাদিকের পূর্ব পর্যন্ত পানাহার ও স্ত্রী সহবাস করতে পারবে।

একদিন কাইস ইবনু সুরমা (রাঃ) সারাদিন জমিতে কাজ করে সন্ধ্যার সময় বাড়ীতে ফিরে আসেন। স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করেন, কিছু খাবার আছে কি? স্ত্রী বলেন ঃ কিছুই নেই, আমি যাচ্ছি এবং কোথাও হতে নিয়ে আসছি। তিনি যান, আর এদিকে তাঁকে ঘুম পেয়ে বসে। স্ত্রী ফিরে এসে তাঁকে ঘুমন্ত অবস্থায় দেখে খুবই দুঃখ প্রকাশ করে বলেন– এখন এই রাত্রি এবং পরবর্তী সারাদিন কিভাবে কাটবে? অতঃপর দিনের অর্ধভাগ অতিবাহিত হলে কাইস (রাঃ) ক্ষুধার জ্বালায় চেতনা হারিয়ে বে-হুঁশ হয়ে যান। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সামনে এ আলোচনা হয়। তখন এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয় এবং মুসলমানেরা সন্তুষ্ট হন।

যেহেতু আল্লাহ তা'আলা রোযাদারের জন্য স্ত্রী সহবাস ও পানাহারের শেষ সময় সুবহে সাদিক নির্ধারণ করেছেন, কাজেই এর দ্বারা মাস'আলার উপর দলীল গ্রহণ করা যেতে পারে যে, সকালে যে ব্যক্তি অপবিত্র অবস্থায় উঠলো, অতঃপর গোসল করে তার রোযা পুরো করে নিলো, তার উপরে কোন দোষ নেই। চার ইমাম এবং পূর্ববর্তী ও পরবর্তী গুরুজনদের এটাই মাযহাব।

عن عائشة (رض:) ان رجلا قال يا رسول الله تدركنى الصلاة وانا جنب فأصوم فقال رسول الله (ص:) وأنا تدركنى الصلوة وأنا جنب فأصوم فقال لست مثلنايا رسول الله قد غفرلك ماتقدم من ذنبك وما تاخر فقال والله انى لارجوان اكون اخشاكم لله واعلمكم بما اتقى *

মা আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি এসে বলল ঃ হে আল্লাহর রাসূল! সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের সময় হলে আমি নাপাক থাকি। অতঃপর আমি রোযা রাখি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ এই রূপ অবস্থা আমারও হয়ে থাকে। আমারও নাপাক অবস্থায় নামাযের সময় হয়। অতঃপর রোযাও রাখি। লোকটি বলল– আপনি তো আর আমাদের মত নন। আপনার সামনের ও পিছনের সব গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়েছে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ আল্লাহর কসম! আমি নিশ্চয়ই আশা করি যে, আমি তোমাদের অপেক্ষা আল্লাহকে অধিক ভয় করি এবং যে বিষয়ে আমি ভয় করি, সে বিষয়ে তোমাদের তুলনায় অনেক বেশী জানি।

(মুসলিম, আবু দাউদ, আহমাদ)

ফজরের নামাযের সময় পর্যন্ত ফরয গোসল না করে থাকাটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য কোন বিশেষ অনুমতির ব্যাপার ছিল না। লোকটির জিজ্ঞাসার জবাবে তিনি নিজের অবস্থা বলে এই বিষয়ে তাঁর কোন বিশেষ সুযোগ থাকার প্রতিবাদ করেছেন এবং বলেছেন যে, আমি তোমাদের তুলনায় প্রকৃত বিষয়ে বেশী ভয় করি তা সত্ত্বেও আমার এরূপ অবস্থা হলে সেই ফজরকালে গোসল করে নামায পড়ি ও রোযা রাখি।

রোযার মাসে নাপাক অবস্থায় ফজর হয়ে গেলেও রোযা রাখায় কোন অসুবিধা নেই এবং এ রোযা কাযাও করতে হবে না। সে নাপাকী স্ত্রী সহবাসে হউক বা অন্য কিছুর ফলে হউক।

আরো স্পষ্ট ভাষায় এ কথা বর্ণিত হয়েছে আয়িশা (রাঃ) ও উম্মু সালমা (রাঃ) হতে। বর্ণনাটির ভাষা এইরূপ ঃ

ان النبى (ص:) كان يدركه الفجر وهو جنب من اهله ثم يغتسل فيصوم *

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ফজর হত অথচ তিনি স্ত্রী সহবাসজনিত নাপাক অবস্থায় থাকতেন। তখন তিনি গোসল করতেন ও রোযাও রাখতেন। (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী)

রোযাদারের দু'আ কবূল হয়

আবূ হুরাইরা (রাঃ) বলেন– রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তিন ব্যক্তির দু'আ কোনদিন বিফল হয় না– (১) রোযাদার যতক্ষণ তিনি রোযা অবস্থায় আছেন, তিনি দু'আ করলে আল্লাহ তাঁর দু'আ কবূল করবেন। (২) ন্যায় বিচারক বাদশাহ যতক্ষণ তিনি ন্যায্য বিচারের উপর আছেন। (৩) মাযলূম ব্যক্তি– যার উপর অন্যায় ভাবে যুলূম করা হচ্ছে। এই তিন প্রকারের লোক দু'আ করলে সাথে সাথে দু'আ কবূল হয়ে যায়। **(আহমাদ)**

হতভাগা ব্যক্তি

আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) বলেন– যখন রামাযান মাসের আগমন হয় সে সময় আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ পবিত্র রামাযান মাস তোমাদের নিকট এসেছে, এই পবিত্র মাসের একটি রাত্রি এক হাজার মাসের রাত্রির বন্দেগী হতেও উত্তম। যে ব্যক্তি সেই রাত্রির নিয়ামত হতে বঞ্চিত সে সর্ববিধ মঙ্গল হতে বঞ্চিত। আর ঐ মহিমান্বিত রাত্রির মঙ্গলামঙ্গল হতে বঞ্চিত হলে জানতে হবে যে, সে বদ-নসীব, হতভাগ্য। **(ইবনু মাজাহ)**

কাব আজরা (রাঃ) বলেন– একদা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে বললেন ঃ তোমরা আমার নিকটবর্তী হও। আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মিম্বরের নিকটবর্তী হলাম। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বরের প্রথম সিঁড়িতে পা রেখে বললেন ঃ আমীন। অতঃপর দ্বিতীয় সিঁড়িতে পা রেখে বললেন ঃ আমীন। অতঃপর তৃতীয় সিঁড়িতে পা রেখে বললেন ঃ আমীন। (অতঃপর তিনি খুৎবা প্রদান করে) মিম্বর হতে অবতরণ করলেন। আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞাসা করলাম ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আজকে যা শুনলাম ও দেখলাম এমন ইতঃপূর্বে শুনিওনি এবং দেখিওনি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আমি যখন মিম্বরের প্রথম সিঁড়িতে পা রাখলাম জিব্রাইল (আঃ) বললেন– ধ্বংস হউক ঐ ব্যক্তি যে পবিত্র রামাযানের মাস পেল আর তার সমস্ত জীবনের পাপসমূহের ক্ষমার ব্যবস্থা হল না। জিব্রাঈল (আঃ) বললেন– বলুন, আমীন, আমি বললাম– আমীন (তাই হউক)। দ্বিতীয় সিঁড়িতে পা রাখার সময় জিব্রাঈল বললেন ঃ ধ্বংস হউক ঐ ব্যক্তি যার সামনে আপনার পবিত্র নাম উচ্চারণ করা হল আর সে ব্যক্তি আপনার নাম শুনে আপনার উপর দরুদ পাঠ করল না। জিব্রাঈল বললেন ঃ বলুন আমীন, আমি বললাম– আমীন। অতঃপর তৃতীয় সিঁড়িতে পা রাখার সময় জিব্রাঈল বললেন ঃ ধ্বংস হউক ঐ ব্যক্তি যে বৃদ্ধ পিতা-মাতাকে পেল আর সে পিতা-মাতার খিদমত করে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারল না। জিব্রাঈল বললেন– বলুন আমীন, আমি বললাম– আমীন। **(মুস্তাদরাক হাকিম, ইবনু হিব্বান, তাবারানী, বাইহাকী, তারগীব)**

রোযা অস্বীকার কারী কাফির

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন– রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ ইসলাম ধর্মের মূল ভিত্তি তিনটি বস্তুর উপর নির্ভরশীল। সেই বস্তুর মধ্যে যদি কোন ব্যক্তি যে কোন একটিকে ইচ্ছাকৃত ভাবে ছেড়ে দেয় তবে সে প্রকাশ্যে কাফির হয়ে যাবে এবং তাকে শারীয়াতে হত্যা করা বৈধ হবে। (সে তিনটি বস্তুর ১মটি) কালিমায়ে তাওহীদের উপর অটল বিশ্বাস স্থাপন করা, (২য়) ফরয নামায সময়মত আদায় করা (৩য়) রামাযান মাসের রোযা রাখা। **(আবূ ইয়ালা)**

এই তিনটি বস্তুর উপর ইসলামের বুনিয়াদ। এই তিনটির মধ্যে যে কোন একটি ইচ্ছাকৃত ভাবে বর্জনকারী প্রকাশ্যে কাফির হয়ে যাবে এবং তাকে হত্যা করা বৈধ হবে। অতএব, রামাযান মাসের রোযা বর্জনকারী প্রকাশ্যে কাফির। তাকে হত্যা করলে কোন পাপ হবে না।

ব্যাধিগ্রস্ত ও ঋতুস্রাব অবস্থায় মেয়েরা রোযা কাযা করবে

আল্লাহ বলেন ঃ তোমাদের মধ্যে কেউ ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে গেলে (আর রোযা রাখা তার পক্ষে সম্ভব না হলে) অথবা সফরের কষ্ট ক্লেশ থাকলে অন্য সময়, অন্য মাসে রোযা রেখে নিবে। আল্লাহ তোমাদের সঙ্গে সহজ সরল সুলভ ব্যবহার করতে চান, তিনি কোন দিন কাওকে কষ্ট ক্লেশে নিক্ষেপ করতে চান না। তোমরা রোযার দিনগুলি গণনা করে পূর্ণ কর এবং তোমরা যে সঠিক পথের যাত্রী, হিদায়াত প্রাপ্ত তার শুকরিয়ার জন্য আল্লাহ নামের তাকবীর পাঠ করে তাঁর প্রশংসা কীর্তনে মত্ত হও।

(সূরা ঃ আল-বাক্বারা– ১৮৫ আয়াত)

মা আয়িশা (রাঃ) বলেন ঃ আমরা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট অবস্থান কালে হায়িযা হয়ে যেতাম, তিনি আমাদিগকে রোযা কাযা করার হুকুম দান করতেন। **(ইবনু মাজাহ)**

মুসাফির রোযা কাযা করতে পারবে

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনা হতে মক্কার দিকে ভ্রমণ কালে আসফান নামক স্থানে পৌছার পর পানি আনিয়ে হাত উত্তোলন করে লোকদের দেখিয়ে রোযা ভঙ্গ করলেন। অতঃপর মক্কায় পৌছলেন। এ ঘটনা সংঘটিত হয় রামাযান মাসে। আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোযা রেখেছিলেন অতঃপর তিনি ইফতার করলেন। এখন ইচ্ছা করলে রোযা রাখতে পার, ইচ্ছা করলে ইফতার করতে পার। **(বুখারী, মুসলিম)**

আবূ দারদা (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ রামাযানুল মুবারাক মাসে কঠিন গরমের দিনে আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে এক সফরে ছিলাম। কঠিন গরমের কারণে আমরা মাথায় হাত রেখে রেখে চলছিলাম। আমাদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আবদুল্লাহ ইবনু রাওয়াহা (রাঃ) ছাড়া আর কেউই রোযাদার ছিলেন না।

(বুখারী, মুসলিম)

হামযা ইবনু আমর আসলামী (রাঃ) বলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমি প্রায়ই রোযা রেখে থাকি। সুতরাং সফরেও কি আমার রোযা রাখার অনুমতি রয়েছে?" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "ইচ্ছে হলে রাখো, না হলে ছেড়ে দাও।"

(বুখারী , মুসলিম)

কোন কোন লোকের উক্তি এই যে, যদি রোযা রাখা কঠিন হয় তবে ছেড়ে দেয়াই উত্তম।

ভুল বশত কিছু খেলে

আবূ হুরাইরা (রাঃ) বলেন ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ভুল বশতঃ পানাহার করল, সে যেন ইফতার করে রোযা নষ্ট না করে। যা খেয়েছে তা তার ভাগ্যের রুজী, আল্লাহ তাকে দান করেছেন। **(তিরমিযী)**

রোযা রাখার পর হঠাৎ যদি কেউ পানি পান করে অথবা কিছু খেয়ে ফেলে আর যদি তার রোযার কথা মনে না থাকে, পেট পূর্ণ করে খেলেও সে যেন রোযা ভঙ্গ না করে। কিন্তু যে মুহূর্তে তার রোযা রাখার কথা মনে পড়বে তার পেটে যেন আর একটি দানা পর্যন্ত না যায়। সে রোযা পূর্ণ করবে। রোযা নষ্ট করবে না।

রোযা ভঙ্গের কাফ্ফারা

আবূ হুরাইরা (রাঃ) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি বিনা কারণে রামাযান মাসে একটি রোযা নষ্ট করে, তার বিনিময়ে সমস্ত জীবন রোযা রাখলেও তার ক্ষতি পূরণ করতে পারবে না। **(তিরমিযী)**

রামাযান মাসের রোযা নষ্ট করলে তার কাফ্ফারা দুই মাসের রোযা এক সঙ্গে রাখতে হবে অথবা একই দিনে ৬০ জন মিসকিনকে পেট পূর্ণ করে তৃপ্তি সহকারে খাদ্য দান করতে হবে। অথবা আরবদের প্রথানুযায়ী বিশ-ত্রিশ হাজার টাকা দিয়ে গোলাম ক্রয় করে তাকে আজাদ করে দিতে হবে। এই মর্মে দ্বিতীয় হাদীস এই যে, আমর ইবনু সায়াদ নিজের পিতা হতে বর্ণনা করেন, আমার পিতা বলেন ঃ একজন লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এসে বলল ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমি ইচ্ছাকৃতভাবে রামাযান মাসের একটি রোযা নষ্ট করেছি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ হয় তুমি গোলাম আযাদ করবে অথবা নিয়মিতভাবে দুই মাস রোযা পালন করবে। অথবা ৬০ জন মিসকিনকে খাদ্য দান করবে। **(আবূ দাঊদ)**

রামাযানের রোযার নেকি আল্লাহ তা'আলা নিজ হাতে দিবেন

عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال : قال رسول الله (ص:) قال الله عزوجل : كل عمل ابن ادم له إلا الصيام ، فإنه لي وأنا أجزي به والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلايرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله ، فليقل : إني صائم والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك للصائم فرحتان يفرحهما : إذا أفطر فحب فطره ، وإذا لقي ربه فربصومه *

আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মহান পরাক্রমশালী আল্লাহ বলেছেন– বনী আদমের প্রত্যেকটি আমল তার নিজের জন্য, রোযা ছাড়া। কারণ তা আমার জন্য এবং আমিই তার প্রতিদান দিব নিজ হাতে। আর রোযা হচ্ছে ঢাল। কাজেই তোমাদের কেউ যখন রোযা রাখে সে যেন বাজে কথা না

বলে, চেঁচামেচি না করে, যদি কেউ তাকে গালি দেয় বা তার সাথে ঝগড়া করে তাহলে তার বলা উচিত আমি রোযাদার। যাঁর হাতে মুহাম্মাদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রাণ তাঁর কসম, রোযাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহর কাছে মিশকের চাইতেও সুগন্ধ যুক্ত। রোযাদারের দুটি আনন্দ, যা সে লাভ করবে। একটি হচ্ছে– সে ইফতারের সময় খুশী হয়। আর দ্বিতীয় আনন্দটি সে লাভ করবে যখন সে তার রবের সাথে সাক্ষাত করবে তখন সে তার রোযার কারণে আনন্দিত হবে।

وفى رواية لمسلم : كل عمل ابن ادم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى سبع مائة ضعف قال الله تعالى : إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به : يدع شهوته وطعامه من أجلي للصائم فرحتن : فرحة عندفطره ، وفرحة عند لقاءربه *

বনী আদমের প্রত্যেকটি আমলের সাওয়াব বাড়ানো হয়, একটি ভাল আমলের জন্য সওয়াব দশগুণ থেকে সাতশতগুণ পর্যন্ত হয়। মহান আল্লাহ বলেন ঃ "তবে রোযা ছাড়া (রোযার সওয়াবের কোন সীমা নেই)। কারণ রোযা হচ্ছে আমার জন্য এবং আমিই তার প্রতিদান দেবো। রোযাদার আমারই জন্য যৌন কামনা ও পানাহার ত্যাগ করে। রোযাদারের জন্য দু'টি আনন্দ। একটি আনন্দ হচ্ছে ইফতারের সময়। আর দ্বিতীয় আনন্দটি হবে তার রবের সাথে সাক্ষাতের সময়। **(মুসলিম)**

শবে ক্বাদারের ফযিলত ও একটি রাত্রি একহাজার মাসের চেয়েও উত্তম

মহান আল্লাহ বলেন ঃ

انا انزلناه فى ليلة القدر *

"আল-কুরআনের মহিমান্বিত কিতাবকে আমি পবিত্র রামাযান মাসে শবে ক্বাদারের রাতে নাযিল করেছি।" মহান আল্লাহ শবে ক্বাদারের

মর্যাদাকে বিশ্ববাসীর সামনে সু উচ্চে তুলে ধরার জন্য আমাদের প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞেস করছেন, লাইলাতুল ক্বাদার কি, তা কি আপনি জানেন?

এই প্রশ্ন করার পর মহান আল্লাহ নিজেই বলছেন– শবে ক্বাদারের একটি রাতের ইবাদত এক হাজার মাসের ইবাদত-বন্দেগী হতেও বেশী উত্তম। পবিত্র রাত্রিতে দলবদ্ধভাবে ফেরেশতা এবং আল্লাহর অনুমতি নিয়ে জিবরাঈল (আঃ) অবতরণ করেন আর সকাল পর্যন্ত তারা বিশ্ব বাসীর উপর সালাম ও শান্তি অবতীর্ণ করতে থাকেন।

আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) বলেন ঃ তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট হতে শুনেছেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে অবহিত করান হয় এবং তাকে তাদের আমল ও সওয়াবের পরিমাণও দেখান হয়। বিগত উম্মতদের বয়স অনুপাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ উম্মাতগণের বয়স অতি কম ও নগণ্য মনে করলেন।

ঠিক সেই মুহূর্তে মহান আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে (সান্তনা দিয়ে অবহিত করলেন) শবে ক্বাদার দান করলেন এবং বলে দিলেন– এই শবে ক্বাদারের রাত্রের ইবাদত এক হাজার মাস হতেও বেশী উত্তম। (মুয়াত্তা)

ওবাদা ইবনু সামিত (রাঃ) বলেন ঃ আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন, শবে ক্বাদারের রাত্রি রামাযান মাসের শেষ দশ দিনের মধ্যেই বিদ্যমান রয়েছে। যথা ২১, ২৩, ২৫, ২৭, ২৯ অথবা রামাযানের শেষ রাত্রি। যে ব্যক্তি এই রাত গুলোতে আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা রেখে ইবাদতে মনোযোগ দিবে, আল্লাহ তার পূর্বের ও পরের গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন। (আহমাদ)

আবূ হুরাইরা (রাঃ) বলেন– রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি শবে ক্বাদারের রাতে ইবাদত করবেন, আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা রেখে তার জীবনের সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। (বুখারী)

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ

انزل এবং انا انزلناه فى ليلة مباركة এবং اناانزلناه فى ليلة القدر
فيه القران এর ভাবার্থ এটাই। অর্থাৎ– কুরআন কারীমকে একই সাথে প্রথম আকাশের উপরে রামাযান মাসের 'ক্বাদারের' রাত্রে অবতীর্ণ করা হয় এবং ঐ রাতকে ليلة مباركة অর্থাৎ বরকতময় রাতও বলা হয়।

ইবনু আব্বাস (রাঃ) প্রমুখ মনীষী হতে এটাই বর্ণিত আছে। যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসিত হন যে, কুরআন মাজীদ তো বিভিন্ন বছর অবতীর্ণ হয়েছে, তাহলে রামাযান মাসে ও 'ক্বাদারের' রাত্রে অবতীর্ণ হওয়ার ভাবার্থ কি? তখন তিনি উত্তরে এই ভাবার্থই বর্ণনা করেন। **(তাফসীর ইবনু মিরদুওয়াই প্রভৃতি)**

তিনি এটাও বর্ণনা করেন যে, অর্ধ রামাযানে কুরআনে কারীম দুনিয়ার আকাশে অবতীর্ণ হয় এবং 'বাইতুল ইয্যা'য় রাখা হয়। অতঃপর প্রয়োজন মত ঘটনাবলী ও প্রশ্নাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে অল্প অল্প করে অবতীর্ণ হতে থাকে এবং তেইশ বছরে পূর্ণ হয়। অনেকগুলো আয়াত কাফিরদের কথার উত্তরেও অবতীর্ণ হয়।

ই'তিক্বাফ

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

ولا تباشروهن وانتم عاكفون فى المساجد *

আর যতক্ষণ তোমরা ই'তিকাফ অবস্থায় মাসজিদে অবস্থান কর, ততক্ষণ পর্যন্ত স্ত্রীদের সাথে মিশো না। **(সূরা ঃ আল-বাক্বারা– ১৮৭ আয়াত)**

ই'তিকাফ অবস্থায় খানা-পিনার হুকুম সাধারণ রোযাদারদের প্রতি নির্দেশেরই অনুরূপ। তবে স্ত্রী-সহবাসের ব্যাপারে এ অবস্থায় পৃথক নির্দেশ দিয়ে বলা হয়েছে যে, ই'তিকাফ অবস্থায় এটা রাতের বেলায়ও জায়িয নয়। এ আয়াতে সে নির্দেশই ব্যক্ত হয়েছে। এবং 'মুবাশিরাত' এর ভাবার্থ

হচ্ছে স্ত্রীর সাথে সঙ্গম এবং তার কারণসমূহ, যেমন চুম্বন, আলিঙ্গন ইত্যাদি। নচেৎ কোন জিনিস লেনদেন ইত্যাদি সব কিছুই জায়িয। ই'তিকাফকারী খুবই প্রয়োজন বশতঃ বাড়ীতে যেতে পারবে, যেমন প্রস্রাব-পায়খানার জন্য বা খাদ্য-খাবার জন্য, তবে ঐ কার্য শেষ করার পরেই তাকে মাসজিদে চলে আসতে হবে। তবে মাসজিদ সংলগ্ন এ সমস্ত ব্যবস্থা থাকলে সেখানেই সেরে নেয়া উত্তম।

সুফিয়া বিন্তে হাই (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ই'তিকাফের অবস্থায় তাঁর খিদমতে উপস্থিত হতেন এবং কোন প্রয়োজনীয় কথা জিজ্ঞেস করার থাকলে তা জিজ্ঞেস করে চলে যেতেন। একদা রাত্রে যখন তিনি চলে যাচ্ছিলেন তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বাড়ীতে পৌঁছিয়ে দেয়ার জন্য তাঁর সাথে সাথে যান। কেননা, তাঁর বাড়ী মসজিদে নববী হতে দূরে অবস্থিত ছিল। পথে দু'জন আনসারী সাহাবীর (রাঃ) সাথে সাক্ষাৎ হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে তাঁর সহধর্মীণীকে দেখে তাঁরা লজ্জিত হন এবং দ্রুত পদক্ষেপে চলতে থাকেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ "তোমরা থামো এবং জেনে রাখো যে, এটা আমার স্ত্রী সুফিয়া বিনতে হাই (রাঃ)।" তখন তাঁরা বলেন ঃ "সুবহানাল্লাহ (অর্থাৎ আমরা অন্য কোন ধারণা কি করতে পারি)!" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বলেন ঃ "শয়তান মানুষের শিরায় শিরায় রক্তের ন্যায় চলাচল করে থাকে। আমার ধারণা হলো যে, সে তোমাদের অন্তরে কোন কু–ধারণা সৃষ্টি করে দেয় কি না!" **(বুখারী, মুসলিম)**

ইমাম শাফিই (রঃ) বলেন যে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর এই নিজস্ব ঘটনা হতে তাঁর উম্মাতবর্গকে শিক্ষা গ্রহণের ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, তারা যেন অপবাদের স্থান থেকে দূরে থাকে। নতুবা এটা অসম্ভব কথা যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মহান

সাহাবীবর্গ তাঁর সম্বন্ধে কোন কু-ধারণা অন্তরে পোষণ করতে পারেন এবং অসম্ভব যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদের সম্বন্ধে এরূপ ধারণা রাখতে পারেন।

উল্লিখিত আয়াতে مباشرت এর ভাবার্থ হচ্ছে স্ত্রীর সাথে মিলন এবং তার কারণসমূহ। যেমন চুম্বন, আলিঙ্গন ইত্যাদি। নচেৎ কোন জিনিস লেন-দেন ইত্যাদি সব কিছুই জায়িয। আয়িশা (রাঃ) বলেন ঃ "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ই'তিকাফ অবস্থায় আমার দিকে মাথা নোয়ায়ে দিতেন এবং আমি তাঁর মাথায় চিরুনী করে দিতাম। অথচ আমি মাসিক বা ঋতুর অবস্থায় থাকতাম। তিনি মানবীয় প্রয়োজন পুরা করার উদ্দেশ্য ছাড়া বাড়ীতে আসতেন না।

যে দিন গুলোতে রোযা রাখা নিষেধ

আবূ হুরাইরা (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছয়দিন রোযা রাখতে নিষেধ করেছেন। তা হল ঃ রামাযানের একদিন আগে এবং ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিত্‌রের দিন আর তাশরীকের তিন দিন (অর্থাৎ ঈদুল আযহার পর থেকে পর পর তিনদিন)।

(মোসান্নাফ আবদুর রায্‌যাক, বাইহাকী, দারাকুত্‌নী, মুসনাদে বায্‌যার, মাজমাউয যাওয়ায়িদ)

রোযাদারের বমি হলে ও করলে

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে রোযাদারের বমি আপনা আপনি হয় তার উপর কাযা রোযা নেই। কিন্তু যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত বমি করল সে যেন ঐ রোযাটা কাযা করে দেয়।

(তিরমিযী, আবূ দাউদ, ইবনু মাজাহ, দারেমী, মিশকাত)

রোযাদারের থুতু গেলা

রোযা অবস্থায় পেট খালি থাকে বলে কারো কারো থুতু খুব বেশী ওঠে। তাদের সম্পর্কে কাতাদাহ (রাঃ) বলেন ঃ রোযাদারের থুতু গিলতে কোন আপত্তি নেই। **(মুসান্নাফ আব্দুর রায্যাক)**

এ ব্যাপারে আতা (রাঃ) বলেন ঃ কেউ যদি কুলি করে মুখের সব পানি ফেলে দেয়, তারপর সে যদি থুতু এবং মুখের ভেতরে যা ছিল তা গিলে নেয় তাতে কোন অসুবিধা নেই। **(বুখারী)**

রোযাদারের কিছু চাখার হুকুম

রোযাদার যখন রান্নার কাজ করে তখন কখনো কখনো তারা ঝাল, লবন, ও মিষ্টি ইত্যাদি স্বাদ গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। তাদের সম্পর্কে বিখ্যাত সাহাবী ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ রোযাদারের জন্য কোন হাঁড়ির কিংবা কোন জিনিষের স্বাদ চাখায় আপত্তি নেই। **(বুখারী)**

অন্য বর্ণনায় তিনি বলেন ঃ রোযা অবস্থায় সিরকা কিংবা কোন জিনিষ চাখতে অসুবিধা নেই যতক্ষণ তা খাদ্যনালীর নীচে না যায়। **(মুসান্নাফ ইবনু আবী শাইবা)**

হাসান (রাঃ)-এর মতে রোযাদারের মধু, ঘি ও ঐ জাতীয় (তরল পদার্থ) চেখে থুতু ফেলাতে আপত্তি নেই। **(ইবনু আবী শাইবা)**

বিখ্যাত তাবেয়ী ইবরাহীম (রহঃ) ও ইকরামা (রহঃ) বলেন ঃ রোযা অবস্থায় মেয়েরা তাদের শিশুদের কিছু চিবিয়ে দিতে পারে যতক্ষণ তা খাদ্যনালী পর্যন্ত না পৌছায়। **(ইবনু আবী শাইবা)**

হাসান (রাঃ) রোযা অবস্থায় কিছু চিবিয়ে তা মুখ থেকে বের করে নিজ শিশুর মুখে দিয়ে দিতেন। **(মুসান্নাফ আঃ রায্যাক)**

রোযাদারের নাকে, চোখে ও কানে ওষুধ দেয়া যাবে

হাসান (রাঃ) বলেন ঃ রোযাদারের জন্য নাকে ওষুধ দেওয়াতে আপত্তি নেই যদি তা খাদ্যনালী পর্যন্ত না পৌছায়। **(বুখারী)**

অযু করা অবস্থায় অনিচ্ছাকৃতভাবে নাকে পানি ঢুকে তা খাদ্যনালী পর্যন্ত পৌছলেও আপত্তি নেই। **(ফতহুল বারী)**

হাসান (রাঃ)-এর মতে রোযাদারের চোখে ওষুধ দিতে কোন আপত্তি নেই। **(মুসান্নাফ ইবনু আবী শাইবা)**

কানে তেল কিংবা পানি দেওয়া এবং সলাকা ঢোকানোয় আপত্তি নেই।

রোযা অবস্থায় মেসওয়াক করা যাবে

আমির ইবুন রাবীআহ (রাঃ) বলেন ঃ আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে অসংখ্যবার রোযা অবস্থায় মেসওযাক করতে দেখেছি।

(তিরমিযী, আবূ দাউদ, ইবনু খুযাইমা)

অন্য বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ রোযাদারের উত্তম অভ্যাসের একটি অভ্যাস মেসওয়াক করা।

(ইবনু মাজাহ, বাইহাকী)

ইবনু ওমার (রাঃ) দিনের শুরু ও শেষ ভাগে দাঁতন করতেন। ইবনু সীরীন বলেন, তাজা ডাল দিয়ে মেসওয়াক করাতে আপত্তি নেই। কেউ বলল ঃ ঐ দাঁতনের একটা স্বাদ তো আছে। তিনি বললেন ঃ পানিরও তো একটা স্বাদ আছে। অথচ তোমরা তা দ্বারা কুলি করে থাক। **(বুখারী)**

এই হাদীস প্রমাণ করে যে, কেবল শুকনো ডাল নয়, বরং রসাল ডাল দ্বারাও রোযা অবস্থায় দাঁতন করা যাবে। এর দ্বারা এও বোঝা যায় যে, বিভিন্ন প্রকার মাজন, ছাই ও কয়লা দ্বারাও রোযাদার দাঁত মাজতে পারে।

শিশুদের রোযা

রোযার এই গুরুত্বের কারণেই সাহাবীগণ ছোট ছোট ছেলেদেরকেও রোযা রাখার অভ্যাস করাতেন। যেমন রুবাইয়্যে' বিনতু মুআওঅয বলেন ঃ আমরা আমাদের বাচ্চাদেরকে রোযা রাখাতাম এবং তাদের জন্য খেলনা রাখতাম। অতঃপর তাদের মধ্যে কেউ যখন খাবার জন্য কাঁদতো তখন আমরা ওটা দিতাম। পরিশেষে ইফতারের সময় হয়ে যেত। (বুখারী)

যুদ্ধক্ষেত্রে রোযা

ইবনু আবী হাইয়্যাহ আহমাসী (রাঃ) রোযা অবস্থায় যুদ্ধের মাঠে লড়ছিলেন। ভীষণ যুদ্ধ হচ্ছিল। লড়তে লড়তে তিনি আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে পড়লেন। তাঁর সঙ্গীরা তাঁকে নিজেদের জায়গায় বয়ে আনলেন। অতঃপর তাঁরা তাঁকে পানি পান করতে দিলেন, কিন্তু রোযা ভাংবে বলে তিনি তা পান করলেন না। কিছুক্ষণ পর তিনি দুনিয়া ছেড়ে চলে গেলেন তাঁরই কাছে যাঁর জন্য রোযা রেখেছিলেন। (ইসা-বা)

রোযা রাখার পারলৌকিক পুরস্কার

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে মাত্র একদিন রোযা রাখে তাকে আল্লাহ তা'আলা জাহান্নাম থেকে এতটা দূরে সরিয়ে দিবেন যতটা দূরে যায় একটি কাক, যে শিশুবেলা থেকে উড়তে থাকে। অতঃপর সে বুড়ো হয়ে মারা যায়

(মুসনাদে আহমাদ, বাইহাকী, মিশকাত, আবূ ইয়ালা, তাবারানী, বায্যার)

অন্য বর্ণনায় জানা যায়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর রাহে মাত্র একটি দিন রোযা রাখবে আল্লাহ তা'আলা তার চেহারাকে জাহান্নাম থেকে সত্তর বছরের পথ দূরে করে দিবেন। **(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত)**

পরকালে রোযা ও কুরআনের শাফাআত

وعن عبد الله بن عمرو ان رسول الله ﷺ قال الصيام والقران يشفعان للعبد يقول الصيام اى رب انى منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعنى فيه ويقول القران منعته النوم باليل فشفعنى فيه فيشفعان ‌*

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) বলেন ঃ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ রামাযান মাসের পবিত্র রোযা ও মহিমান্বিত আল-কুরআন বান্দাদের জন্য শাফাআত করবে। রোযা বলবে প্রভূ হে! আমি রামাযান মাসের রোযা, তোমার এই বান্দাকে দিনের বেলায় পানাহার ও নাফসানী খাহেশাত থেকে সরিয়ে রেখেছিলাম, আল্লাহ তুমি আমার সুপারিশ কবূল কর। অতঃপর কুরআন বলবে– প্রভূ হে! আমি তোমার সেই পবিত্র প্রেরিত আল-কুরআন। তোমার সন্তুষ্টি সাধনে এ বান্দা রাতের আরামের ঘুম পরিত্যাগ করে সমস্ত রাত কুরআন তিলাওয়াতে মত্ত থাকতো। অতএব, তুমি আমার সুপারিশ কবূল কর। (রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–) কুরআন ও রোযার শাফাআত কবূল করা হবে। **(বাইহাকী)**

সাহল ইবনু সায়াদ বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ জান্নাতে আটটি দরজা থাকবে। এই দরজাগুলির মধ্যে একটি দরজা, যার নাম রাইয়ান। (এই রাইয়ান দরজাটি একমাত্র রোযাদার ব্যক্তিগণের জন্য নির্ধারিত) ঐ দরজা দিয়ে একমাত্র রোযাদার ব্যতীত অন্য কেউ প্রবেশ করতে পারে না। **(বুখারী, মুসলিম)**

আল্লাহ তা'আলার মেহেরবানীতে **"রামাযানের সাধনা"** বইটির তৃতীয় পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ বের হওয়ায় তাঁরই রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর দরুদ ও সালাম পাঠ করছি এবং সেই রাব্বুল 'আলামীনের দরবারে শুকরিয়া 'আদায় করছি'—

"আল-হামদু লিল্লাহ"